অন্যজন
ইন্দ্র মিত্র

অন্যজন্ম

ইন্দ্র মিত্র

ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

উৎসর্গ

শতাধিক বর্ষ পূর্বে লোকান্তরিত

আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ

নীলকণ্ঠ মিত্রের

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে

হলুদ, বিবর্ণ হ'য়ে এসেছে পাতাগুলো। অনেকদিন পরে কয়েক পাতা ওল্টাতেই ঝুরঝুর ক'রে একরাশ গুঁড়ো ঝ'রে পড়লো। কুড়িয়ে হ'লো পুরো একমুঠো। সযত্নে রাখলাম একখণ্ড সাদা কাগজের ওপর।

কেউ কি কোনোদিন আবিষ্কার করতে পারবে এই পত্রচূর্ণের মধ্যে কি ছিলো? কোন কথা, কোন কাহিনী, কোন অভিজ্ঞতা? একমুঠো ধ্বংসের দিকে তাকিয়ে মনে হ'লো—আনন্দ-বেদনার সমস্ত অক্ষরই কালকীটের অমোঘ দংশনে একদিন এমনি ক'রে ধুলোয় ঝ'রে যায়।

সাবধানে আস্তে-আস্তে খাতার বাকি পাতাগুলো একেক ক'রে উল্টে দেখলাম। অনেক পাতা এমন অস্পষ্ট হ'য়ে গেছে যে পড়া যায় না। অনেক জায়গা অংশত কীটদষ্ট। সামান্য দু'চার জায়গা এখনো স্পষ্ট বোঝা যায়। গোটা-গোটা কালির অক্ষরে সুন্দর লেখা।

নীলকণ্ঠ মিত্রের লেখা। ডায়েরি—না, ঠিক ডায়েরি না, ডায়েরিতে তো নিজের কথাই লেখা থাকে সাত কাহন। নীলকণ্ঠ মিত্র নিজের কথা বলতে গেলে কিছুই লেখেন নি। যা নিজে দেখেছেন-শুনেছেন-পড়েছেন, নিজের খুশিমতো তারই খানিক-খানিক লিখেছেন।

অতিশৈশবে মা মারা গিয়েছিলেন। নীলকণ্ঠকে লালন-পালন করেছিলেন তাঁর একমাত্র মাসি। সেই মাসি ছিলেন নিঃসন্তান। মেসোমশায়ের যা টাকা-পয়সা ছিলো, তাতে বড়ো হ'য়েও নীলকণ্ঠকে কোনোদিন খাওয়া-পরার কথা ভাবতে হয়নি। খুব কম কথা বলতেন নাকি নীলকণ্ঠ মিত্র। একা-একা থাকতে ভালোবাসতেন। যতক্ষণ বাড়ি থাকতেন, আপন মনে ব'সে শুধু পড়াশোনা করতেন। আর মাঝে-মাঝে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়তেন। ঘুরতে বেরোতেন এখানে-ওখানে। হালিশহর, বর্ধমান, চেতলা, কালিঘাট, রামনগর—এমনি সব জায়গা।

আটান্ন বছর বয়সে মারা গেছেন নীলকণ্ঠ মিত্র। কবেকার কথা সেসব। তাঁর মৃত্যুসালটা জানি। ১৮৫২ সাল।

তা একশো বছরের ওপর হ'য়ে গেলো বৈকি।

আশ্চর্য, জরাজীর্ণ হ'য়েও তাঁর হাতে-লেখা খাতাটা এখনো কোনোক্রমে টিকে আছে। পুরুষানুক্রমে আমিই সেটার অধিকারী। হিসেব ক'ষে দেখেছি, নীলকণ্ঠ মিত্র আমার পঞ্চম পূর্বপুরুষ। আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ।

এ-পর্যন্ত নীলকণ্ঠের বংশধরেরা রক্ষা করেছেন খাতাখানা। আমি বুঝি আর রাখতে পারবো না। আমার মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে কিম্বা হয়তো আগেই বিনষ্ট হ'য়ে যাবে খাতাখানা। নীলকণ্ঠ মিত্রের লেখা!

মায়ের মৃত্যুর পর ছেলেবেলাতেই নীলকণ্ঠ কলকাতায় এসেছিলেন মাসির কাছে। মফঃস্বল থেকে প্রথম যারা কলকাতায় আসতো তখন, তাদের মধ্যে অনেকেই ভুগতো পেটের অসুখে। একে বলতো —লোণা লাগা।

নীলকণ্ঠেরও লোণা লেগেছিলো নাকি। সেই লোণা কাটানোর জন্যে খেতে হ'য়েছিলো কাঁচা থোড়, ঘোল আর কলমির ঝোল, গায়ে মাখতে হয়েছিলো কাঁচা হলুদ। এসব অবশ্যি বড়ো হ'য়ে নীলকণ্ঠ মাসির মুখে শুনেছিলেন।

মাসির কাছে আরো খবরাখবর শুনেছিলেন নীলকণ্ঠ। তারপর নিজেও তো কতো দেখেছেন, পড়েছেন।

গলায় ছ্যাঁকা দিয়ে চোর-ডাকাতকে গঙ্গা পার ক'রে দেওয়া হ'তো কখনো-কখনো। অথবা হাত পুড়িয়ে দেওয়া হ'তো। আর ছিলো তুড়ুম ঠোকা। ফুটোওয়ালা একখণ্ড কাঠে এক রকম ক'রে পা আটকে দেওয়া হ'তো—তার নাম তুড়ুম ঠোকা।

লঘু অপরাধে যাকে বলে গুরুদণ্ড হ'তো তখন। ব্রজমোহন নামে একজন ঘড়িওয়ালা পঁচিশ টাকা দামের ঘড়ি চুরি করেছিলো একটা। সেই অপরাধে ফাঁসি হয়েছিলো তার।

মৃত্যুদণ্ডাদেশ হ'লেও মুসলমান অপরাধীকে ফাঁসি দেওয়া হ'তো না এককালে। চাবুক মেরে প্রাণনাশ করা হ'তো তাদের। এমনি

চাবুক যারা চালাতো, তাদের বলা হ'তো চাবুক-সওয়ার।

নীলকণ্ঠ মিত্র দু'একটা শাস্তির নমুনাও দেখেছেন। তখন অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া হ'তো প্রকাশ্য রাজপথে।

সেই কলকাতার পথের পাশে ছিলো আট-দশ হাত চওড়া বড়ো-বড়ো বিকট নর্দমা। কার সাধ্য যে নাকে পুরু কাপড় না চেপে রাস্তা দিয়ে হাঁটে। পথেই থাকো, ঘরেই থাকো--কলকাতায় সবসময় মশামাছির উৎপাত।

তখন কলকাতা মানে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, ঘুষ, জাল, জোচ্চুরি। ওসব ক'রে কেউ যদি ধনদৌলত জমাতে পারতো তো তাতেও তার সম্মান বাড়তো। আহা, ওর কী বুদ্ধি!

শহরের ধনীরা পাল্লা দিতো একজন আরেকজনের সঙ্গে। পাল্লা দিয়ে ছেলের বিয়েতে লাখে-লাখে টাকা খরচ ক'রেই সিঁদুরেপটির মল্লিকেরা সর্বস্বান্ত হ'য়ে গেলো।

বিয়ে! সেই কলকাতার একটা আশ্চর্য বিয়ের ঘটনা বলি।

পরমানন্দের এক জ্ঞাতিখুড়ো কলকাতায় বাস করতেন। সেই খুড়োমশাই একদিন সূর্যকুমার ঠাকুরের মুখে একটা প্রস্তাব শুনলেন। সত্যি-সত্যি লোভনীয় প্রস্তাব।

সূর্যকুমার ঠাকুরের প্রথমা কন্যা বিবাহযোগ্যা হয়েছে। এই কন্যার জন্যে অনুসন্ধান চলতে লাগলো একটি সদ্বংশীয়, সচ্চরিত্র ও সুপুরুষ পাত্রের। সূর্যকুমার সেই খুড়োমশাইকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে যদি উনি একটি মনোমতো পাত্রের সঙ্গে এই কন্যার বিবাহসম্বন্ধ ক'রে দিতে পারেন, তাহ'লে খুড়োমশাই অবশ্য পুরস্কার পাবেন। কী রকম পাবেন? ভালো। পঞ্চ সহস্র মুদ্রা!

এবার আসল বৃত্তান্ত।

পরমানন্দ দেখতে অতি সুন্দর, তার বংশ নিষ্কলঙ্ক, চরিত্র ত্রুটি-চিহ্নহীন। খুড়োমশাই মনে-মনে ওকে পাত্র ঠিক ক'রে ফেললেন।

মনে-মনে যাই ঠিক করুন, আরেকটি কথাও খুড়োমশাই মর্মে-মর্মে জানতেন। এই বিবাহ পরমানন্দের পক্ষে কুলমর্যাদাহানিকর। সূর্যকুমার ঠাকুরদের হ'লো পীরালি বংশ। সেখানে বিয়ে হ'লে পরমানন্দের

কুলভঙ্গ হয়।

অতএব, খুড়োমশাই বুঝলেন, এই বিবাহ প্রস্তাবে পরমানন্দের বিধবা মা কিছুতেই রাজি হবেন না।

তাহ'লে কি পঞ্চ সহস্র মুদ্রার আশা খুড়োমশাই ছেড়ে দেবেন ?

কেন, একটা কল-কৌশল করা যায় না ?

নিশ্চয়ই যায়।

সেই কৌশলই করলেন খুড়োমশাই।

একদিন খুড়োমশাই গেলেন পরমানন্দের মায়ের কাছে। বললেন যে কলকাতায় এখন একটা পর্বোপলক্ষে নানারকম আমোদ-আহ্লাদ হবে, কালিঘাটে হবে মহাসমারোহ, পূজো-অর্চনা, আরো কতো কী।

খুড়োমশায়ের বড়ো বাসনা যে তার আদরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান পরমানন্দকে এই সব দেখিয়ে আনেন।

সরলহৃদয়া জননী বিন্দুমাত্র সন্দেহ করলেন না। আহা, খুড়োর সঙ্গে ছেলেটা বরং এক-আধটু দেখে-শুনে আসুক।

সানন্দে ও স্বচ্ছন্দে তিনি সম্মতি দিলেন।

খুড়োমশাই পরমানন্দকে সটান কলকাতায় সূর্যকুমারের বাড়িতে নিয়ে এলেন, সূর্যকুমারের হাতে সমর্পণ ক'রে দিলেন। পুরস্কারের সেই পঞ্চসহস্র মুদ্রা নিয়ে অতঃপর খুড়োমশায়ের প্রস্থান।

সেদিনই পরমানন্দের গায়ে-হলুদ হ'য়ে গেলো। বালক পরমানন্দ যখন কাঁদতে সুরু ক'রে দিলো, সূর্যকুমার বহুমূল্য অলঙ্কার দিয়ে ওর কান্না ভুলিয়ে দিলেন, মুছিয়ে দিলেন।

পরমানন্দের জ্ঞাতি-গোষ্ঠী যথাসময়ে সংবাদ পেলো যে বিবাহ সুসম্পন্ন হ'য়ে গেছে। কিন্তু যা হবার, তা তো হ'য়েই গেছে, এখন আর উপায় কি !

পরমানন্দ এ-যাবৎ বাস করেছে তার পূর্বপুরুষের বাসস্থান ভট্টপল্লীতে। কিন্তু এই বিবাহের ফলে পরমানন্দের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেলো ভট্টপল্লীর সমাজের সঙ্গে। তখন থেকে কলকাতা।

জামাইয়ের নাম যদি পরিবারের মেয়েদের পছন্দমতো না হয় তো নাম বদলে রাখা হয়, পরিবারের মেয়েরাই নতুন নাম রাখে। এই

ঠাকুর পরিবারের নিয়ম।

এখন পরমানন্দ নাম কারো পছন্দ নয়। 'পরমান্ন' আর 'পরমানন্দ' —উচ্চারণ বলতে গেলে প্রায় একই রকম। এ-বাড়িতে পরমান্ন নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু। কিন্তু স্ত্রীর মুখে 'পরমান্ন' শুনলে মনে হয় যেন স্বামীর নাম উচ্চারণ করছে। ছী-ছি। ও-নাম বদলে নতুন নাম হ'লো।

ছিলো পরমানন্দ, হ'লো জগন্মোহন।

এই পরমানন্দ ওরফে জগন্মোহনের ছেলেই দক্ষিণানন্দন (পরে 'দক্ষিণারঞ্জন') মুখোপাধ্যায়। ডিরোজিওর পয়লা নম্বর শিষ্য!

কিন্তু সেসব কথা এখন থাক। বরং একটু তীর্থক্ষেত্র দেখি।

কালিঘাট নাম করা তীর্থক্ষেত্র তখন। তবুও কিম্বা সেজন্যেই সেখানে শঠতা, প্রতারণা, বেশ্যাবৃত্তি। তীর্থদর্শনের জন্যে সরলবিশ্বাসী অনেকে আসতেন, তাদের ঠকিয়ে নানারকম উপায় করতো বদ্‌লোকেরা। একদল অসচ্চরিত্র মেয়ে দিনের বেলায় হয়তো যাত্রীদের আশ্রয় জুগিয়ে কিছু রোজগার করতো, আর রাত্রে করতো গণিকাবৃত্তি। রূপ-যৌবন যখন চ'লে যেতো, সেই সব গণিকারাই তখন আবার গৃহস্থের বাড়িতে দাসীগিরি ক'রে জীবন কাটাতো।

অমুক বড়োমানুষ অমুক বাইজীর জন্যে এত হাজার টাকা খরচ করেছেন—এটাও একটা গর্বের বস্তু ছিলো তখন। 'ইনি এর রক্ষিতাকে পাকা বাড়ি ক'রে দিয়েছেন।' —তবে তো ইনি বিলক্ষণ একজন মাননীয় ব্যক্তি!

আড্ডার নেশা ছিলো, নেশার আড্ডা ছিলো। একটা ছড়া আছে:

বাগবাজারে গাঁজার আড্ডা,
গুলির কোন্নগরে,
বটতলায় মদের আড্ডা,
চণ্ডুর বৌবাজারে,
এই সব মহাতীর্থ
যে না চোখে হেরে,

তার মতো মহাপাপী
নাই ত্রিসংসারে।

নীলকণ্ঠ মিত্র অনেক ঘুরেছেন, অনেক দেখেছেন, অনেক শুনেছেন। গোটা-গোটা হস্তাক্ষরে অনেক অভিজ্ঞতা তিনি লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন॥ আর বেশিদিন রাখতে পারবো না বোধ করি খাতাটা, সবগুলো অক্ষরই হয়তো কিছুকালের মধ্যে গুঁড়ো হ'য়ে ঝ'রে যাবে। নীলকণ্ঠ মিত্রের সারাজীবনের অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞান তাঁরই পঞ্চম বংশধরের কাছে চিরবিদায় নেবে।

বৌবাজারের গাঁজার আড্ডার গল্পটা বলি। নীলকণ্ঠ এটা যেন কার কাছে শুনেছিলেন।

গাঁজার সেই দলটার নাম ছিলো— পক্ষীর দল। এ-দলে ভর্তি হবার সময় একেকজন একটি পক্ষীর নাম পেতো। তারপর গাঁজায় যেমন-যেমন দখল বাড়তো, তেমন-তেমন প্রমোশন হ'তো। যতক্ষণ আড্ডায় থাকতো, ততক্ষণ দলের সবাই একেকটা পক্ষী, ততক্ষণ পক্ষীর ভঙ্গিতে চলতো সবাই।

একবার এক ভদ্রলোকের ছেলে তো পক্ষীর দলে এসে ঢুকেছে। ঢুকে খেতাব পেলো—কাঠঠোকরা।

খবর পেয়ে ভদ্রলোক নিজে একদিন সেই আড্ডায় গিয়ে উপস্থিত। কিন্তু যাকেই ছেলের কথা জিজ্ঞেস করেন, কেউ কোনো জবাব দেয় না, শুধু পক্ষীর মতো বুলি ছাড়ে। ভ্যালা বিপদ!

তারপর ছেলেকে আড্ডার এক কোণে আবিষ্কার করলেন, সটান গিয়ে ভদ্রলোক ধরলেন ছেলেকে। কিন্তু ধ'রে কি হবে, ছেলে কি আর তখন মানুষ আছে, কাঠঠোকরা হ'য়ে ব'সে আছে যে!

কড়ড়্ ঠক্ ক'রে ছেলে কাঠঠোকরার কায়দায় বাপের হাত ঠুকরে দিলো।

খুব নাম-ডাক ছিলো চেতলার হাটের। চেতলার হাট থেকে চাল রপ্তানি হ'য়ে যেতো দিগ্বিদিকে। বাখরগঞ্জ, দক্ষিণ মগরাহাট, কুলপী থেকে চাল-বোঝাই অগুণতি নৌকো আর শালতি এসে ভিড়

ক'রে থাকতো টালির খালে। আড়তদার, গোলাদার আর মাঝি-মাল্লার হাঁকাহাঁকিতে সরগরম হ'য়ে থাকতো চেতলা।

অতঃপর বাঙালীরা কেমন ক'রে খাই-খরচ চালাবে—দিন-কে-দিন দাম বাড়ছে—খাদ্যবস্তু অগ্নিমূল্য একেবারে, এমনি একটা আক্ষেপ আছে এক জায়গায়। তারিখ লেখা আছে সেখানে। ২৬ জুলাই, ১৮২২ সাল। ওদিন নীলকণ্ঠ মিত্র চাল কিনেছিলেন আড়াই টাকা মণ দরে, চিনি কিনেছিলেন ন'টাকা মণ দরে। তাই নিয়ে আক্ষেপ। আড়াই টাকা মণ চাল, ন'টাকা মণ চিনি! অগ্নিমূল্য বৈকি।

শতাধিক বর্ষ পরে, এই নীলকণ্ঠ মিত্রের বংশধর, আমিও ভাবছি—সত্যি, বাঙালী কেমন ক'রে খাই-খরচ চালাবে!

তা খাওয়া জানতেন বটে রামমোহন রায়। ডেভিড হেয়ারকে উনিই নাকি প্রথম মাগুর মাছ খাবার কায়দা শিখিয়েছিলেন। রাম মোহনের খাবার পরিমাণ সাংঘাতিক। এক কাঁদি ডাব। চার সের পাঁঠার মাংস। বারো সের দুধ। গোটা পঞ্চাশেক ল্যাংড়া। এমনি আর কি।

রামমোহন রায় মদ খেতেন পরিমিত মাত্রায়। তাঁর মতে পরিমিত মাত্রায় মদ্যপান স্বাস্থ্যরক্ষার অঙ্গ।

আস্তে-আস্তে কলকাতা বদ্‌লে যেতে লাগলো দ্রুত বেগে। গাঁজার নেশা উড়ে গেলো। মদের নেশায় কলকাতা ভেসে যাবার দাখিল।

গোলদীঘিতে ব'সে রাজনারায়ণ বসু বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে এন্তার মদ চালায়। পানের আর মাপ-মাত্রা নেই। যতদূর চালানো যায়।

একদিন রাত্রে নেশায় একেবারে টুপভুজঙ্গ হ'য়ে রাজনারায়ণ বাড়ি এসেছে। এত বাড়াবাড়ি দেখে মা তিতবিরক্ত হ'য়ে বললেন—আমি আর কলকাতার বাসায় থাকবো না, বোড়ালে গিয়ে থাকবো।

ক্রমে-ক্রমে বাবার কানে উঠলো ব্যাপারটা। নন্দকিশোর হচ্ছেন রামমোহন রায়ের শিষ্য। রামমোহনের শিষ্যদের সঙ্গে হিন্দুকলেজের ছাত্রদের মদ্যপান বিষয়ে প্রচণ্ড প্রভেদ। রামমোহনের শিষ্যেরা মদ খায় পরিমিত পরিমাণে।

এ-বিষয়ে রামমোহন রায়ের বিষম কড়াকড়ি। একবার নাকি এক শিষ্য মজা দেখবার জন্যে রামমোহন রায়কে মাপের বেশি মদ দিয়েছিলো। এ-ঘটনা টের পাবার পর রামমোহন ছ'মাস উক্ত শিষ্যের মুখদর্শন করেন নি।

কিন্তু হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা মদে কোনো পরিমাণ-টরিমাণের ধার ধারে না। মদের ব্যাপারে তারা হিসেব মিলিয়ে চলতে রাজি নয়।

যা হোক, নন্দকিশোর ঠিক করলেন, ছেলেকে ওরকম যেখানে-সেখানে মাত্রাতিরিক্ত মদ খেতে দেওয়া ভালো কথা নয়। ওকে পরিমিত মদ্যপায়ী করতে হবে।

সদর দেওয়ানী আদালত আর খাস কমিশনের কাজ-কর্ম এক দালানেই হ'তো তখন। বলতে গেলে, খাস কমিশন সদর দেওয়ানীরই অঙ্গ।

নন্দকিশোর ঐ খাস কমিশনের হেডক্লার্ক। তাছাড়া উনি ঠিকা কাগজ তর্জমা ক'রেও কিছু-কিছু উপায় করেন।

মুন্সী আমীর আলী একজন নামজাদা উকিল। উনি সদর দেওয়ানীর ওকালতিও করেন, খাস কমিশনের ওকালতিও করেন।

নন্দকিশোর আর আমীর আলী—দু'জনে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। মুন্সী সাহেব নন্দকিশোরকে বলেন—রাজদার দোস্ত। এই ফারসী কথাটার অর্থ, এমন বন্ধু যাকে গোপনীয় কথা বলা যায়।

আমীর আলীর বাড়ি থেকে প্রায় প্রত্যেক দিন একটা প্রকাণ্ড টিনের বাক্স আসে নন্দকিশোরের কাছে। ওতে খুব সম্ভব সদর দেওয়ানীর কাগজ-পত্র আছে। বাবা বুঝি ওগুলো তর্জমা করেন।

নন্দকিশোরের ভাবনা, ছেলেকে পরিমিত মদ্যপায়ী করতে হবে। একদিন সন্ধ্যার পর রাজনারায়ণের ডাক পড়লো বাবার লিখবার ঘরে।

ঘরের দরজা বন্ধ করলেন নন্দকিশোর। ব্যাপার কী?

নন্দকিশোর দেরাজ খুললেন। বের করলেন একটি কর্কস্ক্রু, একটি শেরীর বোতল, একটি ওয়াইন গ্লাস। তারপর খুললেন সেই টিনের বাক্সটা।

সদর দেওয়ানীর কাগজ পত্র না কচু, সেই বাক্সের মধ্যে আছে পোলাও, কালিয়া, কোপ্তা!

তখন বাবা রাজনারায়ণকে বললেন—তুমি রোজ সন্ধ্যের পর আমার সঙ্গে এসব খাবে। কিন্তু মদ দু'গ্লাসের বেশি পাবে না। যখনি শুনব অন্যত্র মদ খাও, সেদিন থেকে এসব খাওয়া বন্ধ ক'রে দেবো।

শুধু কি মদ? দিনে-দিনে অবস্থা এমন সাংঘাতিক হচ্ছে যে উপনয়নের সময় পর্যন্ত কোনো-কোনো ছেলে পৈতে নিতে চায় না। কেউ-কেউ পৈতে ফেলে দিচ্ছে।

এমন কি, সন্ধ্যা-আহ্নিক পর্যন্ত ছেড়েছে কেউ-কেউ। জোর ক'রে যদি তাদের ঠাকুরঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তাতেও ফল হয় না। সন্ধ্যা-আহ্নিকের বদলে তারা হোমারের ইলিয়ড থেকে এক নাগাড়ে আবৃত্তি ক'রে যায়।

আরো খারাপ বৃত্তান্ত আছে। মুণ্ডিতমস্তক ফোঁটাধারী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, খেয়াল চাপলো তো এক পাল ছেলে তাকে শুনিয়ে-শুনিয়ে গলা ফাটিয়ে সুর ক'রে চেঁচাতে লাগলো—আমরা গোরু খাই গো, আমরা গোরু খাই গো।

সত্যিই গোরু খায়। গোমাংস নিয়েও একদল বাঙালী বাবু উন্মত্ত।

একদিন উইলসনের হোটেলে দু'জন বাঙালী বাবু আহার করতে গেছেন। দু'য়ের মধ্যে একজন একেবারে পাকা গোমাংসখোর। খানসামাকে ডেকে তিনি শুধোলেন—Veal হায়?

খানসামা বললো—নহি হায় খোদাওন্দ।

—Beefsteak হায়?

—ওভি নহি হায় খোদাওন্দ।

—Oxtongue হায়?

—ওভি নহি হায় খোদাওন্দ।

—Calf's foot Jelly হায়?

—ওভি নহি হায় খোদাওন্দ।

বাছুরের মাংস নেই, বড়োটুকরো গোমাংস নেই, ষাঁড়ের জিভ নেই, বাছুরের খুরের জেলি পর্যন্ত নেই। আছেটা কী ?

বাবু অধৈর্য হ'য়ে বললেন—গোরুকা কুচ্ হ্যায় নহি ?

বাবুর সঙ্গীটি এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। তার আর সহ্য হ'লো না। বিরক্ত হ'য়ে তিনি তখন খানসামাকে বললেন—ওরে, বাবুর জন্যে গোরুর আর কিছু না থাকে তো খানিকটা গোবর এনে দে না।

কৃষ্ণমোহন ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেছে মিশনারিদের। একবার কয়েক রাত্রি বন্ধু-বান্ধব নিয়ে কলকাতার রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে, ভুল বাঙলায় মিশনারিদের বাঁকা-বাঁকা উচ্চারণের নকল করেছে কৃষ্ণমোহন। তার উদ্দেশ্য—মিশনারিদের লোকচক্ষে হাস্যাস্পদ ও হেয় প্রতিপন্ন করা।

কিন্তু এই কৃষ্ণমোহনই পরে একজন গোঁড়া খ্রীষ্টান পাদরি হয়েছিলেন। আচ্ছা, সেসব কথা এখন থাক।

ধানের আবাদ হ'তো মির্জাপুরে, সিমলেয়। বিস্তর পচা পুকুর ছিলো ওদিকটায়। সন্ধ্যের পর ওদিকে বহুদিন পর্যন্ত কেউ হাঁটা-চলা করতো না।

কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ার আর সার্কুল্যার ক্যানাল—এসব জায়গাকে সবাই বলতো, খুনী জায়গা।

কর্ডাইস লেনকে লোকে বলতো—গলা-কাটা গলি। ও-গলিতে কেউ হাঁটতো না। গলা কাটা যাবার ভয়।

চৌরঙ্গী তো জঙ্গল ভর্তি। সেখানে বাঘ ডাকতো। কিছু-কিছু সাহেব শুধু বাস করতো ও-এলাকায়। ডাকাত তাড়ানোর জন্যে তারাই সন্ধ্যের পর বন্দুকের আওয়াজ করতো। সাহেবদের কাজ সেরে বাড়ি যাবার সময় চাকর-খানসামারা লুঠ-তরাজের ভয়ে ভালো ভালো জামা-কাপড় মনিবের বাড়িতেই রেখে যেতো।

আস্তে-আস্তে চৌরঙ্গীর চেহারা বদলাতে লাগলো। ভালো-ভালো রাস্তা হ'লো। সন্ধ্যার পর অনেকে গাড়ি বা পাল্কি চেপে বেড়াতে আসতো। জ্বলন্ত মশাল নিয়ে পাল্কির সঙ্গে দৌড়ুতো মশালচিরা।

দূর থেকে মনে হ'তো যেন কয়েকটি উজ্জ্বল মশাল ছুটে যাচ্ছে। ভারি সুন্দর দেখাতো। এ-দৃশ্য নীলকণ্ঠ মিত্র বহুবার প্রত্যক্ষ করেছেন।

আর, কোচম্যান-সহিসের পোষাক-আষাকের নমুনা দেখেই বোঝা যেতো মনিব বাবুর দাপট। যার পোষাকে যতো জেল্লা, তার বাবু তত ভারি। গাড়ি মোড় ঘুরবার সময় তো নিশ্চয়ই, এমনিতেও সহিসরা সুর ক'রে উঁচুগলায় হাঁক দিতো। গলার গুণ দেখাতো।

নানারকম ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া পাওয়া যেতো তখন। চার ঘোড়ার গাড়ি, দু'ঘোড়ার গাড়ি। ভাড়াটে গাড়ির দোকান ছিলো কয়েকটা। যেমন—ক্রিষ্টোফার ডেক্সটার কারখানা, ষ্টুয়ার্ট কোম্পানি, সেটান, কুক, হার্ট ব্রাদার্স, ভেলাণ্ট আর ব্রাউন কোম্পানি।

ষ্টীমার লাইনও খোলা হ'লো তারপর। কলকাতা থেকে চুঁচুড়া পর্যন্ত—ভাড়া জনপ্রতি আট টাকা।

মর্মান্তিক দুঃসংবাদ এলো একদিন।

ব্রিষ্টলের ষ্টেপলটন গ্রোভে রামমোহনের দেহান্ত হয়েছে। দিল্লীর বাদশা তাঁকে ন্যায্য প্রাপ্য পাঠায়নি, তাঁকে বঞ্চনা করেছে তাঁর দেশবাসী। শেষের দিনগুলো তাঁর কেটেছে অর্থের দুশ্চিন্তায়, দারিদ্র্যে, বাড়িওয়ালার তাগাদায়।

রামমোহনের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে দ্বারকানাথ অসহায় শিশুর মতো হু-হু ক'রে কেঁদেছিলেন।

এই ঘটনার ওপর তিনপাতাব্যাপী একটা বিষণ্ণসুন্দর বিবরণ লিখেছিলেন নীলকণ্ঠ মিত্র। আটবছর আগেও একবার সেটা খুলে দেখেছিলাম। কিন্তু এখন আর তার একটি অক্ষরও অবশিষ্ট নেই। আমি দুঃখিত।

যা আছে, তা-ও থাকবে না। সব যাবে, সব যাবে। বহু কথা ও কাহিনী সঞ্চিত নীলকণ্ঠ মিত্রের এই খাতাখানাও আজ বাদে কাল নশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে।

এপাতা-ওপাতায় খানিক-খানিক কথা ও কাহিনী ছাড়িয়ে-ছিটিয়ে

আছে টুকরো-টুকরো হ'য়ে। একশো বছরের পুরোনো বাঙলা ভাষায় লেখা।

দুর্বোধ্য ভাষা। নীলকণ্ঠ মিত্রের আমলের বাঙলা!

ভাষান্তর না করলে সরাসরি কিছু বোঝা কঠিন। সর্বশেষ ওয়ারিশান হিসেবে নীলকণ্ঠ মিত্রের খাতাখানার প্রতি আমার অবশ্যই একটা গুরুতর কর্তব্য আছে।

তাই, আপতত আমি প্রয়োজনমতো ভাষান্তর করি, টুকরোগুলো জুড়ে-গেঁথে একের পর এক সাজিয়ে যাই।

এক

সে হ'লো গিয়ে ১৮০৩ সালের কথা

মেসোমশাই হাঁ-ও বলেননি, না-ও বলেননি।

মাসিমার ইচ্ছেতেই মাষ্টার বহাল হয়েছিলেন। তাঁর কাছে আমি ইংরেজি শিখতাম। কতোকালের কথা সেসব।

তাড়াতাড়ি কতোগুলো ইংরেজি শব্দের বাঙলা অর্থ রপ্ত করানোর জন্যে একটা ছড়া শিখিয়েছিলেন মাষ্টারমশাই। এই ঘরে ব'সেই দুলে-দুলে মুখস্থ করেছিলাম ছড়াটা, মাষ্টারমশাইকে খুশি করেছিলাম।

বছর বারো আগে মাষ্টারমশাই মারা গেছেন, মাসিমাও নেই, মেসোমশাই আছেন বাতে পঙ্গু হ'য়ে। কতো উত্থান-পতন, কতো অদল-বদল হয়েছে তারপর, কতো কথা ভুলে গেছি তখনকার, কিন্তু আশ্চর্য, সেই ছড়াটা এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে।

গাড ঈশ্বর, লাড ঈশ্বর,
কম মানে এসো,
ফাদার বাপ; মাদার মা,
সিট মানে ব'সো।
ব্রাদার ভাই, সিষ্টার বোন,
ফাদার-সিষ্টার পিসী,
ফাদারইন্‌ল মানে শ্বশুর,
মাদার-সিষ্টার মাসী।
আই মানে আমি, আর
ইউ মানে তুমি,
আস্ মানে আমাদিগের
গ্রাউণ্ড মানে জমি।
ডে মানে দিন, আর নাইট মানে রাত,
উইক্‌কে সপ্তাহ বলে, রাইস্ মানে ভাত।

জ পড়তে হ'লে পয়লা দফায় পড়তে হ'তো স্পেলিং বুক, স্কুলমাষ্টর, কামরূপা ও তুতিনামা। স্কুলমাষ্টর বইয়ে অনেক কিছু থাকতো- গ্রামার, স্পেলিং, রীডর। কামরূপা বইয়ে এক রাজপুত্তুরের গল্প। ফারসী ভাষায় 'তুতিনামা' একখানা বিখ্যাত বই; তার ইংরেজি অনুবাদ।

আরবি নাইট যে পড়তো, সে তো অত্যধিক প'ড়ে ফেলতো। আর রয়াল গ্রামার? কথায় বলতো, রয়াল গ্রামার ময়াল সাপ। মানে, রয়াল গ্রামার ময়াল সাপের মতো বৃহৎ; ওকে ঘায়েল করা বাপ্ চাট্টিখানি কথা নয়।

ভাগ্যগুণে এই রয়াল গ্রামার যদি কেউ পড়তেন তো জনগণের চক্ষে তিনি অসাধারণ ব্যক্তি। না, ওর মতো বিদ্বান ভূ-ভারতে নেই।

কিন্তু যে যাই পড়ুক, আসল কাণ্ড স্পেলিং নিয়ে। ইংরেজিতে স্পেলিংই সারকথা।

স্পেলিং নিয়ে বিবাহসভায় পর্যন্ত বিস্তর পীড়াপীড়ি হ'তো। ইংরেজি-ওয়ালারা ইনি উনির বিদ্যার বহরখানা দেখতে চাইতেন। স্পেলিং বলুন, স্পেলিং বলুন।

Nebuchadnezzar স্পেলিং কী? আপনি বলুন Xerxes, আপনি Xenophon?

ইনি উনির নাম জিগ্যেস করতেন, তা-ও কদাকার ইংরেজিতে। What denomination put your papa?

Flower, flour, floor—তিনটি শব্দের উচ্চারণই সেকালের লোকের মুখে একরকম—ফ্লোর। কিন্তু তিন শব্দের তিন অর্থ; অতএব একবারেই সেগুলোকে কায়দা করতে হ'তো। ফ্লোর (flower) ফুল, ফ্লোর (flour) ময়দা, ফ্লোর (floor) মেঝে।

এক শব্দের তিন অর্থও একসঙ্গে সারতে হ'তো। Well—আচ্ছা, ভালো, পাতকো। Bear—সহ, বহ, ভল্লুক।

একেকজন আবার—এলাহি কাণ্ড—আস্ত ডিক্‌সনারিখানাই মুখস্থ ক'রে ফেলতেন। একেকজন Walking Dictionary!

ইস্কুলে-ইস্কুলে তখন ইংরেজি ঘোষানো হ'তো। আজ কী ঘোষাতে হবে? গ্যার্ডেন না স্পাইস?

আজ গ্যার্ডেন ঘোষানো হোক।

ব্যস, সঙ্গে-সঙ্গে সর্দার পোড়ো বাগান-সংক্রান্ত ছড়া সুর ক'রে চেঁচাতে সুরু করলো। প্রথমে সর্দার চেঁচাতো, শোনাশুনি বাকি ছাত্রেরা তালমাফিক গলা দাগাতো।

পম্‌কিন্ লাউ কুমড়া, কোকোম্বর শসা।
ব্রিঞ্জেল বার্তাকু, প্লোমেন চাষা॥

এছাড়া কখনো-কখনো গানের রাগ-তালের ঢঙেও ইংরেজি শব্দের অর্থ শেখানো হ'তো। এই যে একটা খাম্বাজ রাগিণী তাল ঠুংরি।

নাই (Nigh) কাছে, নিয়র (Near) কাছে, নিয়রেষ্ট অতিকাছে।
কট্ (Cut) কাট, কট (Cot) খাট, ফলোয়িং (Following) পাছে॥

আরো হ'তো। তবলা-ঢোলক-মন্দিরা সহযোগে আরবি নাইটের পালা বাড়ি-বাড়ি গান ক'রে বেড়ানো হ'তো। সেই পালা ইংরেজি পয়ারে লেখা।

এত ক'রেও ফায়দা ওৎরায় নি সবসময়। কারো-কারো ইংরেজির দৌড় বড়ো জোর ইস্-মিস্-ঠিস্।

'ঢেঁকি' ইংরেজি কী?

না, টু মেন ধাপুড়-ধুপুড় ওয়ান মেন সেকে দেয়।

সাহেবদের যে-সমস্ত বাঙালী কর্মচারী থাকতো, তাদের ভাষাভঙ্গিও ছিলো বহুবিচিত্র। আমি তখনও ছাত্র, ডেভিডসন সাহেবের কাছে মাঝে মাঝে যাই, ইংরেজী বুকনি শিখতে, উচ্চারণ রপ্ত করতে।

একদিন গিয়ে দেখি বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটি দেশীয় ব্যক্তির কথা শুনছেন মনযোগ দিয়ে। বুঝলাম ব্যক্তিটি সাহেবের কর্মচারী। সাহেব মনিব লোক। মনিব আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন অথবা মেরে ফেলতে পারেন, সাহেবকে একথা নিজের ইংরেজিতে বললো সেই কর্মচারী। —মাষ্টর ক্যান লিব, মাষ্টর ক্যান ডাই।

শুনে তো সাহেব মারবার জন্যে লাঠি তুললেন—What, master can die?

না, Die বোধ হয় ঠিক হয়নি। সাহেব, মেরো না। কর্মচারীটি হাত উঁচু ক'রে বললো—ষ্টাপ (Stop) দেয়ার। তারপর নিজের

আঙুল দিয়ে নিজেকে দেখিয়ে বললো—ডাই মি। মানে, আমাকে মেরে ফেলতে পারেন। —ইফ মাষ্টর ডাই, দেন আই ডাই, মাই কো (Cow) ডাই, মাই ব্লাক ষ্টোন (শালগ্রাম ঠাকুর) ডাই, মাই ফোরটীন জেনারেষণ ডাই।

শেষে বুঝতে পারলেন ডেভিডসন, হেসে ফেলে বললেন, যাও আর কখনো যেন এমন না হয়। আর হাসতে হাসতে বললেন, এর ইংরিজী আর এমন কি অদ্ভুত। শিববাবুর ইংরিজী—সে আরও মজার! বললেন সে গল্পটা।

শিববাবু রথের দিন কামাই দিলো। পরদিন যখন গেলো, সাহেব জিগ্যেস করেছিলেন—কাল আসোনি কেন?

এখন বাঙালীর সুপুত্তুর সাহেবের বাচ্চাকে রথের ব্যাপার বোঝাবে কেমন ক'রে? ভেবে-চিন্তেও কূল-কিনারা পাওয়া কঠিন।

ঠিক, রথের আকৃতি গির্জার মতো। তাই শিবচন্দ্র একটু টেনে-টেনে জিভের ডগা দিয়ে উচ্চারণ করলো—চর্চ্চ।

কিন্তু চর্চ্চ বললে তো ইঁটের গাঁথুনি বোঝায়। রথ যে কাঠের।

তাই পরক্ষণেই বললো—উডেন চর্চ্চ।

তিনতলা সমান উঁচু, সেকথাটাও একটু ব্যাখ্যা করলে হ'তো না? আবার বলতে হ'লো—থ্রি ষ্টারিস্ হাই।

তার ওপর জগন্নাথদেব ব'সে আছেন, সেটা হ'লো কই?

—গাড আল্‌মাইটি সিট অপন।

তথাপি রথযাত্রার আরো বিস্তর কথা বাকি থেকে যাচ্ছে। লম্বা-লম্বা দড়ি, হাজারজন তাই ধরেছে, জোরে-জোরে টানছে আর দৌড়ুচ্ছে, হরিবোল দিচ্ছে। এসবের ইংরেজি? —লাং লাং রোপ, থৌজণ্ড মেন্ ক্যাচ, পূল, পূল, পূল, রনাওয়ে, রনাওয়ে, হরি হরি বোল, হরি হরি বোল।

দুই

অসুখ-বিসুখের সম্ভাবনা ষোলো আনা, কিন্তু সুস্থ হবার সম্ভাবনা নেই একরত্তি। টাকার জোর যাদের আছে, তাদের জন্যে ভালো ডাক্তারও আছে। যারা গরীব-দুঃখী তারা ব্যামো-পীড়ায় ভালো ডাক্তারকে ডাকতে পারে না, ভগবানকে ডাকে। ভগবানকে ডাকতে পয়সা লাগে না।

অল্প পয়সা জোগাড় হ'লে কখনো-সখনো বড়ো জোর কবরেজ ডাকে। ডাকসাইটে কবরেজ নয়, হাতুড়ে কবরেজ। এরা রাস্তায়-রাস্তায় থলি হাতে ঘুরে বেড়ায়। কেউ হয়তো রোগ ধরতে পারলেন, কিন্তু নির্ভুল ওষুধ বানাবার মুরোদ নেই। হয়তো কেউ ওষুধ বানাতে জানেন, কিন্তু নাড়িজ্ঞান নেই একবিন্দু। শাস্ত্রজ্ঞান যার লবডঙ্কা তার মুখে অনবরত খই ফুটছে। শাস্ত্রজ্ঞান যার আছে তার এমন সঙ্গতি নেই যে শাস্ত্রসম্মত ওষুধ-বিষুধ তৈরী করেন। থাকলে কি তিনি থলি হাতে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন? ঘুরতেন রোগীর দরজায়-দরজায়? রোগীর ঘরের সামনে আহ্বানের অপেক্ষায় ভিক্ষুকের মতো ঘুরঘুর করতেন?

আশ্চর্য, এদের হাতেও তবু রোগী বাঁচে কখনো-সখনো। তখন বিশ্বাস হয় ভগবানের অস্তিত্বে। তখন মনে হয়, ভগবান সত্যিই করুণাময়।

করুণাময়ের কথা নয়, শুনলাম একজন হাতুড়ে কবরেজের কেচ্ছা!

গেরস্থ বাড়িতে অসুখ। শেষ পর্যন্ত ডাক পড়লো কণ্ঠাভরণ কবরেজের। ভিজিটের টাকা ট্যাঁকে গুঁজে এক মনে রোগীর নাড়ি দেখলেন তিনি, জিজ্ঞাসাবাদ করলেন হাজার রকম। তারপর বহুৎ

বিচার-বিবেচনার পর রায় দিলেন—শক্ত ব্যামো। আর কোনো কবরেজ দেখিয়েছিলে ?

হুঁ। বাড়ির কর্তা একেক ক'রে কয়েকজন কবরেজের নাম করলেন।

শুনে কণ্ঠাভরণ মশায়ের ঈষৎ হাস্য। —অন্য কবরেজরা যখন পারে না, তখনই আমার ডাক পড়ে। ভালো, ভালো। তা এখন আর ভাবনা নেই। আমি যখন এসে পড়েছি তখন বুঝতে হবে রোগীর পরমায়ু আছে। আমি শেষ না ক'রে ছাড়বো না।

শেষের বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কিসের শেষ ? রোগের না রোগীর ?

যাক্ গে। কণ্ঠাভরণ মশাই বললেন—ছাখো, আমার কাছে আজে-বাজে চিকিৎসা নেই। আমার ওপর যদি চিকিৎসার ভার দিতে চাও তো আমি যা বলি তাই করো। রোগীর কিছু করতে পারবো না অথচ ভুজুং দিয়ে টাকা নিয়ে যাবো, আমি তেমন কবরেজ নই। আসল কথা কি, ব্যামোটি বড়ো শক্ত, জ্বর অতীসার। ওষুধটাও তেমন জোরালো চাই, বৃহৎ বাসাবলেহ চূর্ণ। এতে সোনা-রূপো-মুক্তো-টুক্তো লাগবে, প্রায় শ'দুই টাকার মতো খরচ পড়বে। টাকা দিতে যদি মন কেমন-কেমন করে, তবে সাফ কথা বলি, জিনিস-পত্তর জোগাড় ক'রে দাও, আমি এখানে ব'সে ওষুধ বানিয়ে দিচ্ছি। আমার কাছে সেসব ইয়ে পাবে না।

একেবারে প্রাণ-জল-করা বাক্য। বাড়ির কর্তা আত্মীয়-কুটুমের সঙ্গে পরামর্শ করতে বসলেন। কিন্তু সংখ্যাল্প হ'লেও প্রায় সর্বত্রই এক-আধজন বিচক্ষণ ব্যক্তি থাকেন। তেমনি একজন কর্তাকে বললেন—যদি তুমি এত টাকা খরচ করতে রাজি হও, তবে তো ইংরেজ ডাক্তারই ডাকতে পারো। তারা বিজ্ঞ চিকিৎসক, ভালো চিকিৎসা করবেন। আমার তো মনে হয়, সেই ভালো।

ভালো ? ইংরেজ ডাক্তার ভালো ? কণ্ঠাভরণ মশাই রাগে ফেটে পড়লেন। এখানে আসাই ভুল হয়েছে। এখানে মান-সম্মান থাকে না। বলে কি না, ইংরেজ ডাক্তার ভালো !

কণ্ঠাভরণ মশাই বললেন—ইংরেজ ডাক্তার বড়ো গাড়ি চেপে আসেন, সঙ্গে পেয়াদা-চাপরাশি, বাক্স-প্যাঁটরা। ওসব দেখে লোকে ভাবে, উনি বুঝি বড়ো চিকিৎসক। কিন্তু ইংরেজ ডাক্তার চিকিৎসার কী জানে, শুনি? ওরা জানে কেবল ঠেসে জোলাপ দিতে। অথচ নিদানে লেখা আছে, মল ভান্ত ন চালয়েৎ। আজ পর্যন্ত কোথাও দেখেছো যে ইংরেজ ডাক্তার রোগী ভালো করেছে?

সেই বিচক্ষণ ব্যক্তি সবিনয়ে একাধিক উদাহরণ দিলেন। ইংরেজ ডাক্তার অমুককে ভালো করেছে, তমুককে ভালো করেছে।

কচু জানো তবে। আসল ব্যাপার জানেন কণ্ঠাভরণ মশাই। অমুক-তমুকের অসুখের ওখানে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং কণ্ঠাভরণের মামা বিশারদ মশাই। আর তার জন্যেই সে-যাত্রা রক্ষা পেয়েছিলো অমুক-তমুক। বিশারদ মশাই না থাকলে ইংরেজ ডাক্তারের বাপের সাধ্যি আছে রোগী ভালো করে?

ইংরেজ ডাক্তারের কথা থাক। বাড়ির কর্তা আত্মীয়-কুটুমের সঙ্গে পরামর্শান্তে কণ্ঠাভরণকে বললেন—কবরেজ মশাই, আমি বলি কি, আমাদের বাড়ির বাঁধা কবরেজকেও ডাকি। আপনি তার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যা ভালো হয় তাই করুন।

অতি উত্তম প্রস্তাব। কণ্ঠাভরণ মশাই বিগলিত গলায় বললেন—বেশ, কেউ তাকে ডাকতে যাক। আমি এমন নই যে নিজের ছাড়া আর কারো মতামত শুনবো না। তবে সময় বড়ো কম। আমি বরং এদিকে ফর্দটা বানিয়ে ফেলি। উনি এলে তখন পরামর্শ ক'রে যা হবার হবে। আর ভালো কথা, সোনা-মুক্তোর ওষুধ বানাতে অনেক টাকা লাগবে, অনেক সময়ও অযথা নষ্ট হবে, অনেক অসুবিধা। তার থেকে বলি কি, মাত্র দেড়শো টাকা আমাকে দাও, আমার কাছে তৈরী ওষুধ আছে। আর…

আর একখানা ফর্দ দিলেন কণ্ঠাভরণ মশাই। —এখানা নিয়ে একজন যাও গোবর্ধন সা'র দোকানে। পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে তাকে শুধু বললেই হবে যে কণ্ঠাভরণ মশাই পাঠিয়েছেন। ব্যস্, আর কিছু বলতে হবে না। ওতেই সে সমস্ত মাল-মশলা দিয়ে দেবে'খন।

কতো কম খরচে, কতো কম সময়ে, কেমন চমৎকার ব্যবস্থা দিলেন কণ্ঠাভরণ মশাই। তার দৌলতে কতো সুসার হ'লো। কিন্তু সেদিকে কি কোনো ব্যাটার কাণ্ড-জ্ঞান আছে?

যাক্, ততক্ষণে ও-বাড়ির বাঁধা কব্‌রেজ মশাই এসে পড়েছেন। তাকে দেখে তো কণ্ঠাভরণ মশাই মহাখুশি। —আরে বাবাজী তুমি! ভালো, ভালো। এখন এদের একটু শুনিয়ে দাও তো আমি কেমন লোক, কেমন কবরেজ। আরে বাপু তুমি আর আমি কি আলাদা। তুমি হ'লে গিয়ে আমার মাসতুতো ভায়ের ছেলে। বলতে গেলে, আমরা হলাম গিয়ে এক ঘরের লোক।

তারপর কণ্ঠাভরণ মশাই বললেন রোগীর কথা। এই রোগ, এই ওষুধ। এই অবস্থা, এই ব্যবস্থা। চোখে ছাখো, কানে শোনো। বিচার-বিবেচনা করো। প্রয়োজন হ'লে পরামর্শ দাও।

কিন্তু বাড়ির বাঁধা কব্‌রেজ কণ্ঠাভরণ মশায়ের কথায় বিনয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন প্রায়। বললেন—আমি আর কী পরামর্শ দেবো, আপনি উত্তম ব্যবস্থা করেছেন। আমিও এই ওষুধের কথা ভেবেছিলাম, কিন্তু কী করবো বলুন, এ-বাড়ির লোক যাকে বলে হাড়কঞ্জুষ। আপনি অতি সুব্যবস্থা করেছেন। আপনি আমার বাবার সামিল। আপনার কাছে সুব্যবস্থা না হ'লে আর কার কাছে হবে, শুনি?

টাকাকড়ি নিয়ে কবরেজরা বিদায় নিলেন। কিন্তু বেলা আড়াই প্রহর নাগাদ আবার আসতে হ'লো। রোগীর অবস্থা বড়ো খারাপ। বোধ হয় অন্তিম সময়।

অভয়বাণী বিতরণ করছেন কবরেজ মশাই। এসে পড়েছি যখন, আর ভয় কী। ওষুধ তৈরী করতে সময় পাওয়া গেলো না, কিন্তু তা ব'লে শুধু হাতে আসিনি। এই জারা সোনা-মুক্তো রোগীর শরীরে মাখাও, ছাখো এতে যদি কিছু উপশম হয়।

উপশম হচ্ছে না তবু, অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপের দিকে যাচ্ছে। উপায় নেই, রোগী এখন সমস্ত চিকিৎসার বাইরে চ'লে গেছে। আর, এ তো জানা কথাই। তুমি-আমি তো সামান্য কবরেজ মাত্র,

স্বয়ং শিব এলেও এ-ব্যাধি নিরাময় করতে পারতেন না। তবু রোগীর ভাগ্য ভালো বলতে হবে। আমরা না এলে রোগী কক্ষনো মৃত্যুর আগে গঙ্গাস্পর্শ পেতো না। ভাগ্যিশ, যথাসময়ে এরা আমাদের ডেকেছিলো। আর দেখছো কী, সত্বর রোগীকে গঙ্গাযাত্রা করাও।

গঙ্গাতীরে রোগী অনবরত বিছানায় হাত-পা ঘষতে লাগলো। শয্যাকণ্টকের লক্ষণ। মা কবরেজ মশাইকে বললেন—বাছা আমার বিছানায় অমন ক'রে হাতড়াচ্ছে কেন?

কবরেজ মশাই বললেন—একটা জিনিস খুজছে।

কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রী সন্তান মৃত্যুর মুহূর্তে কী চাইছে, তা জানতে না পেলে মায়ের প্রাণে শান্তি নেই। মা আবার বললেন—কী জিনিস কবরেজ মশাই?

—শিঙ্গা।

—শিঙ্গা দিয়ে কী করবে?

অম্লানবদনে কবরেজ মশাই মায়ের মুখের ওপর বললেন—শিঙ্গা দিয়ে আর কী করবে, শিঙ্গা ফুঁকবে।

এখানে এ-সময়ে এ-হেন জবাব দিতে হয়তো যমের জিভেও বাধে।

তিন

উনুনে ডাল চাপিয়ে স্ত্রী গেছেন পুকুরে, জল আনতে। রান্না-ঘরে বসিয়ে গেছেন স্বামীকে। ইনি একজন ভট্টাচার্য পণ্ডিত।

হেনকালে ডাল তো উথলে উঠলো। উথলে প্রায় প'ড়ে যাবার দাখিল। বিষম বিপদ!

ডালের উথলে-পড়া ভট্টাচার্য মশাই কী প্রকারে নিবারণ করবেন? কোনো উপায় ভেবে পাচ্ছেন না ভট্টাচার্য।

যদিও কিছু স্থির করা গেলো না, তবুও চোখের সামনে ডাল উথলে প'ড়ে যাচ্ছে, এ-দৃশ্য উনি কী ক'রে সহ্য করেন? উপায়ান্তর না দেখে অগত্যা ভট্টাচার্য মশাই পৈতেজড়ানো হাতখানা ডালের উপর ধ'রে চণ্ডীপাঠ করতে লাগলেন। কিন্তু উথলে-পড়া ডাল কি চণ্ডীপাঠ শোনে?

এমন সময় ভট্টাচার্য-গৃহিণী পুকুর থেকে ফিরলেন। ব্যাপারখানা নজর ক'রে বললেন—এ কি? এতে একটু তেল ফেলে দিতে পারোনি?

ব'লে ডালে একটু তেল ফেলে দিলেন। বলা বাহুল্য, ডালের উথলে-পড়া তক্ষুনি বন্ধ হ'য়ে গেলো। . . .

তা তো হ'লো, কিন্তু এবম্বিধ দৃশ্য দর্শনে ভট্টাচার্য একেবারে আরেক রকম হ'য়ে গেলেন। মুহূর্তে এমন আশ্চর্য কাণ্ড যে করতে পারলো, সে কে, সে কী !!

তখন ভট্টাচার্য একেবারে গললগ্নীকৃতবাস হ'য়ে ব্রাহ্মণীকে বললেন —তুমি কে আমার গৃহে অধিষ্ঠিতা, বলো; অবশ্য কোনো দেবী হবে, নতুবা এই অদ্ভুত ব্যাপার কী প্রকারে সাধন করলে?

আরেকজন ভট্টাচার্য একদিন রাত্রে নিবিষ্টমনে ব'সে ব'সে পুঁথি পড়ছিলেন। পড়তে-পড়তে অনেক রাত্রি হ'য়ে গেলো। সেই অনেক রাত্রে ভট্টাচার্যের বড়ো বাসনা হ'লো একটু তামাক খাবার।

বাসনা তো হ'লো, এখন এই গভীর রাত্রে টিকে ধরাবার মতো একটু আগুন পাই কোথায়? —মনে-মনে এই কথা ভাবতে-ভাবতে ভট্টাচার্যের ঠাহর হ'লো, দূরে একটা ইটের পাঁজা পুড়ছে। তবে আর ভাবনা কী।

অতএব টিকে নিয়ে আস্তে-আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। দূরের পাঁজা থেকে টিকে ধরিয়ে ঘরে ফিরলেন, তামাক খাওয়াও হ'লো।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য কথা হ'লো যে, আগুনের জন্যে ওর দূরের পাঁজা ঠাহর হ'লো অথচ একবারও খেয়াল পড়লো না, ঘরেই প্রদীপ জ্বলছে!

বর্ণনায় কিঞ্চিদধিক বাহুল্য থাকলেও একথা অনায়সেই বোঝা যায়, পুরোনো আমলের ভট্টাচার্যেরা কতো সাদাসিধে ছিলেন। কতো-খানি বিষয়বোধবর্জিত, কতো সরল, কতো সুন্দর।

আর আজকাল? কে একজন একখানা রসালো নক্সা গেঁথেছেন আজকালকার ভট্টাচার্য নিয়ে। আমার খুব খাঁটি লেগেছে নক্সাটা। ওটা একেবারে হুবহু না হোক, ভট্টাচার্যদের গতিপ্রকৃতি আজকাল সত্যি-সত্যি অতি কুচ্ছিত। জাহান্নামে নেমেছে ভট্টাচার্যেরা!

এক ভট্টাচার্যের পেটে বিদ্যার নামে কচু, কিন্তু অভাব-অভিযোগ বিস্তর। অগত্যা সে এক বাবুর বৈঠকখানায় যাওয়া-আসা সুরু করলো। যদি বাবুকে পটিয়ে-পাটিয়ে একটা টোল খোলা যায়!

বাবু বললেন—ভশচায্যি মশায়, সুরাপানে কি পাপ হয়? সঙ্গে সঙ্গে ভট্টাচার্য জবাব দিলেন—একথা যে ব'লে বেড়ায়, আসলে পাপ হয় তার। সুরাপানে পাপ কিসের?

তারপর তন্ত্রের দু'খানা মুখস্থ বচন ঝেড়ে দিয়ে বললেন—পাপ দূরের কথা, মদ ছাড়া যে উপাসনাই হয় না। অধিক কী, স্বয়ং বলরাম ঠাকুর পর্যন্ত মদ পান করতেন।

বাবু মহাতুষ্ট। টোল খুলে দিলেন। টোলের পণ্ডিতের পদ পেলেন ভট্টাচার্য। যা হোক, একটা হিল্লে হ'য়ে গেলো ভট্টাচার্যের।

শুধু খাওয়া-পরার ব্যবস্থা হওয়া নয়, টোলের পণ্ডিতের সম্মান আছে আলাদা। এখানে-ওখানে তার নেমন্তন্ন হয় অন্নপ্রাশনে, বিবাহে,

শ্রাদ্ধে, বিভিন্ন পাল-পার্বণে।

এই ভট্টাচার্যের বাবু তো তবু ভালো, টোলের পণ্ডিত আর বাবুর একখানা বিচিত্র বৃত্তান্তও শোনা গেছে এক জায়গায়। বাবু অত্যন্ত বিষয়ী ব্যক্তি; তিনি বিবেচনা ক'রে দেখলেন, বিষয়-কর্মে আর তেমন রোজগার হয় না, অথচ নেমন্তন্নে গিয়ে টোলের পণ্ডিতেরা দু'হাতে কামাচ্ছে। টুলো পণ্ডিত একেক নেমন্তন্নে প্রধান বিদায় বাবদ নগদ পায় প্রায় শ'দুয়েক টাকা, কখনো-সখনো রুপোর ঘড়া, সোনার গাড়ু। অতএব, খোলো একখানা টোল। পণ্ডিতি দিলেন একজন হাড়-হাভাতে বামুনকে; তার সঙ্গে ব্যবস্থা রইলো, নেমন্তন্ন-টেমন্তন্নে যতো টাকাকড়ি ইত্যাদি প্রাপ্তি হবে, সেসব এনে বাবুকে দিতে হবে; পণ্ডিত কেবল বেতন পাবে মাসিক দশ টাকা, আর কিছু না। সন্দেহ কি, এ-বাবু বিচক্ষণ ব্যবসায়ী। এমন বিচক্ষণ কোটিতে গুটির অধিক হয় না।

ভট্টাচার্যদের নিত্যকর্মপদ্ধতি একেবারে ছকে বাঁধা। কোশাকুশি নিয়ে প্রাতঃস্নান ক'রে বাড়ি ফিরে আহ্নিক সেরেই হাঁক পাড়েন। তৎক্ষণাৎ ভৃত্য হাজির। হবিষ্যের জন্যে কী আনা হয়েছে?

বাজারের অবস্থা তেজী বড্ড, ভৃত্য এনেছে পুঁয়ের থাড়া আর শিঙিমাছ। উত্তম চালের ধবধবে ভাত হ'লো, চচ্চড়ি হ'লো। ঘি দুধ দই তো ঘরেই আছে।

হবিষ্যান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম। তারপর ছাত্রদের নিয়ে বসতে হয় টোলে। নামেই টোল, কিন্তু টোকা দিলে বোল ফোটে না। যাকে বলে, শূন্যগর্ভ।

হয়তো এমন হ'লো যে কোনো যথার্থ জ্ঞানান্বেষী ব্যক্তি গুরুতর একটি প্রশ্ন নিয়ে এলেন ভট্টাচার্যের কাছে। অথচ ভট্টাচার্যের পেটে এমন এলেম নেই যে সে-প্রশ্নের সিকিপরিমাণ জবাবটুকুও দিতে পারে। তখন?

কিন্তু সহজে ভড়কে যাবার পাত্র নয় ভট্টাচার্য। তখন বলবেন—আজ বিশেষ ব্যস্ত আছি; প্রশ্নের উত্তর অনেকখানি, আপনি দয়া ক'রে আরেকদিন আসবেন।

এবং আরেকদিনও সেই একমেবাদ্বিতীয়ম উত্তর—আজ বিশেষ ব্যস্ত, আরেকদিন আসবেন। তথাপি দয়া ক'রে স্বীকার করবেন না নিজের মুরোদের ওজন। ছাড়বেন না মুখের বারফট্টাই। ভট্টাচার্য পণ্ডিত সর্ববিদ্যাপারঙ্গম।

কিন্তু দুটো আসল জিনিসে কস্মিনকালেও ভুল হয় না ভট্টাচার্যদের ; যার-যার নিজের বাবুর বাড়ির বৈঠকখানায় হাজিরা আর পরচর্চার আসর জমানো!

বাবুর বাড়ি হাজিরা না দিলে হাঁড়ি চড়ে না, অতএব যেতে হয়। আর পরচর্চা না করলে পেটের হবিষ্যান্ন হজম হয় না, অতএব এলাকার ভট্টাচার্যেরা দৈনন্দিন আড্ডা জমায় নিয়মিত। নিজেদের মধ্যে যতো কামড়াকামড়ি থাক পরের ব্যাপারে সব ভট্টাচার্যের এক রা। কারো হাঁড়ির কোনো নতুন সমাচার আছে ?

আছে। এক বুড়ির বাকরোধ হয়েছে, গঙ্গাযাত্রাও হয়েছে। কোন বুড়ি ? না, অমুকের মা। অ-মু-ক ? তবে তো শ্রাদ্ধে জাঁক-জমক হবে খুব।

সঙ্গে-সঙ্গে কাছাকোঁচা সামলে ভট্টাচার্যেরা সুপারিশের জন্যে যে যার বাবুর বাড়ি ছুটলেন। —বাবু, অমুকের মাকে গঙ্গাযাত্রা করানো হয়েছে, শ্রাদ্ধে ব'লে-ক'য়ে আমাকে নেমন্তন্ন করাতে হবে কিন্তু।

বাবু বললেন—ভালো, আগে মৃত্যু হবে, তবে তো···

হবে, হবে, নিশ্চয়ই হবে। —ভবিতব্য যেন ভট্টাচার্যের নখাগ্রে। —কতোকাল হ'য়ে গেলো শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন পাইনি। এ-বুড়ির নিশ্চয়ই অবিলম্বে মরণ হবে, নইলে যে অভাবে-অভাবে আমাদের মরণ!

সাধু, সাধু। কিন্তু এতেও ক্ষান্তি নেই। পরদিন একজন ভট্টাচার্য গেলেন গঙ্গাযাত্রিণী বুড়িকে দেখতে। অবস্থা কেমন ? পুত্র বললো—আপনাদের আশীর্বাদে মা বোধ হয় এ-যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেলেন। কাল বাকরোধ হয়েছিলো, আজ দিব্যি কথাবার্তা কইছেন।

অ্যাঁ! ভট্টাচার্যের মস্তকে গদাঘাত। কোনোগতিকে নিজের অবস্থা সামলে নিয়ে ভট্টাচার্য বললেন—আহারের অবস্থা কেমন ?

—আহার নেই। সেজন্যেই বড়ো ভাবনা।

শুনে ধড়ে প্রাণ এলো ভট্টাচার্যের। —ভালো। তা ভাবনার কিছু নেই। দুর্গা মঙ্গল করবেন।

কিন্তু মনের মধ্যে বিষম ভাবনা ভট্টাচার্যের—কার মঙ্গল করবেন দুর্গা? আমার না বুড়ির?

বুড়ির সেই পুত্র বললো—আশীর্বাদ করবেন ভশ্‌চায্যি মশাই। —তা আর বলতে। যেদিন থেকে অসুখ শুনেছি, ব'লে সেদিন থেকে স্বস্ত্যয়ন করছি।

তারপর প্রায় দু'দণ্ড রাত নাগাদ ভট্টাচার্য এলেন বাবুর বাড়ি। বাবু বললেন—কী হে ভট্টাচার্য আজ বিকেলে যে তোমার দেখা পেলাম না।

আর দেখা! —ভট্টাচার্য একেবারে নেতিয়ে পড়েছেন। —ওদিকে যে সর্বনাশ হয়েছে।

—কী সর্বনাশ?

—আর কী। সেই শ্রাদ্ধের আশায় ছাই। কাল বুড়ির বাক্‌রোধ ছিলো, আজ দিব্যি কথা-বার্তা বলছে, শুনে এখন আমার বাক্‌রোধের দশা। তবে একটা সুসংবাদ আছে।

—সুসংবাদটা শুনি।

—বুড়ির আহার বন্ধ। অতএব, কিঞ্চিৎ ভরসা আছে এখনো। এটুকু না থাকলে, বিবেচনা করুন, ওখান থেকে আমি কি এখন সুস্থ-শরীরে এ-পর্যন্ত হেঁটে আসতে পারতাম?

চার

যে যাই বলুক, ইহলোকে সুখ-শান্তি কিম্বা দুঃখ-দুর্গতিতে তেমন কিছু আসে-যায় না। আমরা বাঙালী, আমরা হিন্দু। জীবনান্তে পরলোকে স্বর্গলাভই আমাদের আসল লক্ষ্য। আর স্বর্গলাভের মোক্ষম উপায় তো মেয়েদের হাতের মুঠোয়। সহমরণ। শাস্ত্রে নাকি আছে, মৃত স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হ'লে মহিলাদের অক্ষয় স্বর্গে অবারিত অধিকার হবে।

অতএব, সহমৃতা হও। এক স্বামীর চিতায় অবলীলায় আত্মাহুতি দেয় এক কিম্বা একাধিক স্ত্রী। এই আত্মহুতি স্ত্রীর সতীত্বের প্রমাণ। তাদের বিশ্বাস, আত্মাহুতির ফলে জন্মান্তরে তারা আবার এই স্বামীর ঘরণী হবে। অথবা হবে বৈকুণ্ঠবাসিনী।

বৈকুণ্ঠ কিম্বা জন্ম-জন্মান্তরে অদ্বিতীয় স্বামি-সঙ্গিনী হবার বড়ো কামনা হিন্দু নারীর প্রাণে নেই।

পঁয়ত্রিশ কি ছত্রিশ বছর বয়সে ওলাওঠায় মারা গেলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক কীর্তিচন্দ্র ন্যায়রত্ন। কোন্নগরে ইহলীলা সম্বরণ করলেন রাধাকৃষ্ণ ন্যায় বাচস্পতি। অভয়ানন্দ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য। পরমানন্দ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য। রামকুমার তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য। রামদুলাল ন্যায়বাচস্পতি ভট্টাচার্য। দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়। শ্যামশঙ্কর ভট্টাচার্য। রামধন বাচস্পতি। গণেশ ন্যায়বাগীশ ভট্টাচার্য। আনন্দ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ফকির চন্দ্র বসু। কটা নাম আর জানি! ওদের প্রত্যেকের শবদেহের সঙ্গে চিতায় উঠেছে একেকজন সতী-সাধ্বী স্ত্রী। হরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দু'জন পত্নী, দুজনেই সতীসাধ্বী।

একজন ব্রাহ্মণ মারা গেলেন। ব্রাহ্মণীর ইচ্ছা হ'লো সহমরণের। স্বয়ং জজসাহেব এসে কতো অনুরোধ-উপরোধ করলেন! সাধ্যমতো চেষ্টার ত্রুটি রাখলেন না সাহেব। আগুনে পুড়ে যাওয়া বড়ো কষ্ট। সুস্থ মনে ভেবে দেখো!

তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে সাহেবের সামনে আপন আঙুল আগুনে পোড়ালেন ব্রাহ্মণী। কই, আগুনে পুড়লে নাকি খুব কষ্ট?

সাহেব আর কথাটি কইলেন না।

ব্রাহ্মণীর বাসনা পূর্ণ হ'লো।

এমন অনেক ঘটনার কথাই শুনতাম, স্বচক্ষে দেখলাম সেই প্রথম।

নদীর নাম সুরধুনী। তীরে শ্মশান।

সেখানে মৃতস্বামীর সঙ্গে এসেছে তার আঠোরো বছর বয়সী পরমা সুন্দরী স্ত্রী। সহমরণে যাবে।

সমাচার শুনে শান্তিপুরের থানাদার ছুটে এলেন শ্মশানে। আমরাও কয়েকজন বন্ধুবান্ধব এলাম সন্দেহ ভঞ্জন করতে। কেন সহমৃতা হবে এই অপরূপা নারী, বয়স যার মাত্র আঠারো? দারিদ্র্য? আত্মীয়দের বিদ্রূপের ভয়?

স্বামীর যা বিষয়-সম্পত্তি আছে তাতে স্বচ্ছন্দে চলে যাবে স্ত্রীর আজীবন ভরণপোষণ। দারিদ্র্য নয়।

আত্মীয়েরা কেউ জোর করেনি ওকে সহমরণের জন্যে। আত্মীয়দের বিদ্রূপের ভয়ও নয়।

তবে কেন এই আত্মহত্যা?

মেয়েটি বললো—স্বামিশবের সঙ্গে সহমৃতা হ'লে আমি চতুর্দশ ইন্দ্রকাল পর্যন্ত পতিলোকবাসিনী হ'তে পারবো। সতীসাধ্বী না হ'লে এই স্বর্গভোগ হয় না।

আর কে না জানে সতীসাধ্বী মাত্রেই সহমৃতা হয়।

কিন্তু তবুও শান্তিপুরের থানাদার হাল ছাড়ে না। ঐ নারীর দুটি শিশুসন্তানকে সামনে এনে সে বললো—তুমি নিজে বাঁচো, তুমি এদের বাঁচাও, তুমি এদের মা।

আমরা দূর থেকে দেখি, নিশ্বাস রোধ ক'রে অপেক্ষা করি। কিন্তু সন্তানার্থেও বাঙালীর মেয়ে স্বর্গের ছাড়পত্র ফিরিয়ে দেয় না। বাঙালীর মেয়ের কাছে মাতৃত্বের চেয়ে সতীত্বের মূল্য ঢের বেশি।

স্বামিশব জড়িয়ে শুয়ে পড়লো মেয়েটি। স্বামী-স্ত্রীকে একত্রে পাট দিয়ে ঢেকে তারপর দড়ি বেঁধে আত্মীয়েরা চিতায় আগুন দিলো।

চিতাগ্নির লাল ছায়া জ্বললো সুরধুনীর জলে।

সে-দৃশ্য মন থেকে আজও মুছে ফেলতে পারিনি।

আরেকটি ঘটনার কথা বলি।

চার বছর পর্যন্ত বনিবনা নেই, আলাদা বাড়িতে থাকে। কিন্তু স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে স্ত্রী নির্ভুল চ'লে এসেছে স্বামিগৃহে। তিরিশ বছরের মেয়ে জজসাহেবের কাছে আবেদন জানালো—আমি সহমৃতা হবো, অবিলম্বে অনুমতি দাও।

প্রার্থনাপত্র পেয়ে সাহেব সটান চ'লে এলেন প্রার্থনাকারিণীর ঘরে। হলুদ মেখে আম্রশাখা হাতে নিয়ে পিঁড়ি পেতে ব'সে আছে সদ্যস্বামিহীন তিরিশ বছরের মেয়েটি। তার কাছে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে সাহেবের। কী?

সাহেব বললো—পুড়ে-পুড়ে এভাবে আত্মঘাতিনী হ'য়ো না। সহমরণে ক্ষান্ত দাও। যদি আত্মীয়েরা তোমাকে অনাদর করে, অপমান করে, সেসব দুশ্চিন্তা তুমি ক'রো না। আমি তোমাকে ঘর বানিয়ে দেবো, যাবজ্জীবন ভরণপোষণের ব্যবস্থা ক'রে দেবো।

কিন্তু তিরিশ বছরের মেয়ের দৃঢ়বিশ্বাস সে গত তিনজন্মেও এই স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হয়েছে; স্থিরকণ্ঠে সবিনয়ে সে বললো—সাহেব, তুমি বরং তাড়াতাড়ি আমার সহমরণের ব্যবস্থা ক'রে দাও যাতে আমি জীবনান্তে সুখ পাই।

দিগন্তে সূর্যাস্ত সমাপ্ত। অতএব স্থির হ'লো, আগামীকাল সূর্যোদয়ের পর সহমরণে যাবে।

সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় একটি তিরিশ বছরের মেয়ে মৃতস্বামীর সঙ্গে চিতারোহণে দেহত্যাগ করে, একথা একজন সাহেবের পক্ষে স্বচ্ছন্দে বিশ্বাস করা কঠিন। হয়তো রাত্রে কোনো মাদকদ্রব্য খেয়ে নিজেকে অপ্রকৃতিস্থ ক'রে রাখবে মেয়েটি। আচ্ছা, সেদিকে কড়া নজর রাখতে হবে। সাহেব সেখানে রেখে এলো তত্ত্বাবধানের লোক।

কিন্তু না, সেসব কিছু না। মৃতস্বামীর শয্যাশিয়রে ব'সে অনিদ্র নয়নে রাত্রি পার ক'রে দিয়েছে তিরিশ বছরের মেয়ে। পরদিন সূর্যোদয়ের পর স্বামিশববাহন খাটে ব'সে শ্মশানে এসে নামলো মেয়েটি। নির্ভয়, নিষ্কলুষ।

শ্মশানে কোনো বয়স্ক ব্রাহ্মণ মিললো না। অগত্যা মন্ত্রপাঠ করলো চোদ্দবছরের এক ব্রাহ্মণবালক। তারপর হরিধ্বনি ক'রে স্থিরপায়ে চিতারোহণ করলো মেয়েটি। কেউ তাকে ধরেনি, কেউ তাকে বাঁধেনি, জোর করেনি কেউ।

একজন সাহেব তখনো আশ্বাস দিলো—আমি তোমাকে টাকা দেবো, ঘর দেবো, পাল্কি দেবো।

—আমি এই পাল্কিতে চললাম।

ব'লে তিরিশ বছরের মেয়ে সাহেবের বোবা চোখের সামনে মৃত স্বামীকে কোলে নিয়ে চিতায় শুয়ে পড়লো!

যখন চিতা জললো দাউদাউ, আশ্চর্য কাণ্ড, সাহেব লক্ষ্য ক'রে দেখলেন, তিরিশ বছরের মেয়ের শরীরের কোনোখানে একবিন্দু স্পন্দন চিহ্ন পর্যন্ত ফুটলো না।

কলকাতা থেকে পশ্চিমে যাবার পথে কোন্নগরে আরেক আশ্চর্য সহমরণ দেখেছে দু'জন সাহেব।

একটা পেল্লায় গর্ত খুঁড়েছে মাটিতে অনেক লোক। গর্তের মধ্যে শোয়ানো হ'লো একজন যোগীর মৃতদেহ। অতঃপর সেই যোগীর স্ত্রী নেমে দাঁড়ালো গর্তের মধ্যে। যোগীর উনিশ বছরের ছেলে নিজের হাতে তিনবার মুঠো ভ'রে মাটি দিলো গর্তে। তারপর হাত মেলালো অন্যান্য শ্মশানবন্ধুরা। দ্যাখ-না-দ্যাখ ভর্তি হ'য়ে গেলো গর্ত, যার গর্ভে যোগীর সঙ্গে সহমরণে গেলো তার সতীসাধ্বী পত্নী। কিন্তু আশ্চর্য, একবিন্দু দুঃখ নেই যোগীপুত্রের, সাহেবের কাছে সাড়ম্বরে সে বললো নিজের কথা, শ্মশানাগত আত্মীয়-কুটুমের কথা, সদ্যমৃত বাবার কথা, সদ্যসহমৃতা মায়ের কথা।

যেন এমন সতীসাধ্বী মায়ের ছেলে হ'য়ে জন্মানো কতো বড়ো গর্বের বস্তু।

কিন্তু সকল নারীই কি এই নিদারুণ আত্মহত্যার মূল্যে পরলোকে স্বর্গবাস কামনা করে? না।

কোন্নগরে কমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় সাকুল্যে বত্রিশবার বিয়ে করেছেন। তার মধ্যে ইতিপূর্বেই লোকলীলা সম্বরণ করেছেন দশজন

স্ত্রী। বাকি বাইশজন জীবিত।

কমলকান্ত তখন মারা গেলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে সংবাদ চ'লে গেলো বাইশ শ্বশুরবাড়িতে। আঠারোজন স্ত্রী এলেন না, চারজন শ্মশানে এলেন অবিলম্বে। একজন কলকাতা থেকে, একজন বাঁশবেড়ে, বাকি দু'জন কাছেই ছিলেন। চারজনেরই বয়স ত্রিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। সহমরণে গেলেন চারজনই।

বাকি আঠারোজন বাদ।

এই আঠারোজন তবু গেলেন না, হালিশহরের এক ব্রাহ্মণবধূর আরেক বৃত্তান্ত শুনি। বাইশ বছর বয়সে স্বামী মারা গেলো তার। তাকে শ্মশানে নিয়ে এলো আত্মীয়েরা। তার সহমরণ তো কেবল তারই স্বর্গার্থে নয়, এই অনুষ্ঠানে আত্মীয়দেরও লভ্যাংশ আছে। তাদের সম্মান বাড়বে সমাজে, প্রতিপত্তি বাড়বে প্রতিবেশির কাছে, হিসেবের খাতায় পুণ্যের ঘরে জমা হবে একটা স্ফীতকায় অঙ্ক। শাস্ত্রাচারের অনুশাসন অবশ্যমান্য। পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত পালন ক'রে পরলোকের পথ প্রশস্ত রাখো। নারীর মূল্যে। নারীমেধের মাধ্যমে।

যাক্ গে, ঐ আঠারো বছরের ব্রাহ্মণবধূর কথাটা শেষ করি। আত্মীয়েরা তাকে শোনালো শাস্ত্রবাক্য, দেখালো স্বর্গলোভ। তখনো দ্বিধায় দ্বিখণ্ড হ'য়ে আছে আঠারো বছরের ব্রাহ্মণবধূ। এই মুহূর্তেই সে স্বর্গে যাবে না মাটির পৃথিবীতে থাকবে।

দ্বিধা, লজ্জা, ভয়। কিন্তু এই সুবর্ণ সময়, আত্মীয়েরা আর বিলম্ব করলেন না। এক ব্যক্তি মেয়েটির অর্ধ-ইচ্ছুক হাত ধ'রে অতিদ্রুত চিতার চারদিকে সাতবার ঘুরে এলেন। তারপর মেয়েটিকে শবের সঙ্গে শক্ত ক'রে বাঁধলেন সুদৃঢ় বন্ধনে।

চিতায় আগুন জ্বালিয়ে শ্মশানবন্ধুরা তুললো তুমুল হরিধ্বনি, হরি নামের প্রচণ্ড কোলাহল। যাতে মেয়েটির আর্তনাদের কণামাত্র কারো কানে এসে না লাগে, কারো মন স্পর্শ ক'রে মুহূর্তের দুর্বল ভালো-বাসায় একটা অশাস্ত্রীয় অঘটন না ঘটায়।

ঈশ্বর করুন, যেন কোমল করুণ হৃদয়দৌর্বল্য ধর্মাচরণের প্রতিবন্ধক না হয়।

কিন্তু সম্প্রতি বড়ো বাধা-বিপত্তি। সহমরণ সম্পর্কে শাদা সাহেবেরা নানা নিয়ম বাঁধছেন, নির্দেশ দিচ্ছেন। অথচ শাস্ত্রদ্রোহ করছেন না। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছেন, তারপর নতুন নিয়ম রচনা ক'রে আস্তে-আস্তে ভাঙছেন চলিত শাস্ত্রাচারের বিষদাঁত, সহমরণের প্রথা। আর আশ্চর্য, সেসব নিয়ম রচনার ভিত্তি হচ্ছে শাস্ত্রসিদ্ধ যুক্তি।

ষোলোবছরের কমবয়সী মেয়ে কিম্বা গর্ভবতী নারী অথবা অতিশিশু সন্তান-সন্ততির জননী আর যেতে পারবে না সহমরণে। আইনে বারণ। হ্যাঁ, এই নিষেধ শাস্ত্রসিদ্ধ। খবর পাওয়া গেছে, অনেক সময় মাদক দ্রব্য প্রয়োগ ক'রে আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো-কোনো নারীকে সহমরণে যেতে বাধ্য করা হয়। এটা অশাস্ত্রীয়, এটা বে-আইনী। অতএব, ভবিষ্যতে সাবধান।

আইন কার? সাহেবের।

সাহেব তো বিধর্মী, বিদেশী; দেশের মধ্যেও সহমরণ নিয়ে তুমুল তর্ক। এমন কি, একজন ভদ্রলোক পুস্তক পর্যন্ত লিখেছেন সহমরণের বিপক্ষে। ভদ্রলোক লিখেছেন, সহমরণের বিষয় যথার্থ বিচার করলে শাস্ত্রে নাকি কিছু পাওয়া যায় না। অ্যাঁ, এতদূর লিখেছেন, এতখানি লিখেছেন? ভদ্রলোক কে? আর কে, রামমোহন রায়।

কিন্তু সতীর পক্ষে, সহমরণের সপক্ষে আছেন বহু পণ্ডিত, একাধিক গণ্যমান্য মহামহিমার্ণব। আছেন নিমাইচাঁদ শিরোমণি, হরনাথ তর্ক-ভূষণ, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপীমোহন দেব, রাধাকান্ত দেব, মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, নীলমণি দে, গোকুলনাথ মল্লিক, ভবানী চরণ মিত্র, রামগোপাল মল্লিক। এঁরা একজোট হ'য়ে দরবার জানালেন বেণ্টিঙ্ক সাহেবের কাছে। -সাহেব, তুমি অতি উত্তম ব্যক্তি। তুমি দুষ্টদমন করো, তুমি শিষ্টপালন করো। ধর্ম-সংস্থাপনের জন্যেই এদেশে তোমা-হেন মহাপ্রভুর শুভাগমন হয়েছে। হালে সহমরণ নিয়ে নানারকম ব্যক্তি বহুবিধ গোলমাল করছে। অথচ সহমরণ আমাদের শাস্ত্রসিদ্ধ ধর্ম। সাহেব, তুমি অতি উত্তম ব্যক্তি। অতএব, হে সাহেব, তুমি নজর রেখো যেন আমাদের চিরকালের শাস্ত্রোক্ত ধর্ম-কর্ম কিম্বা

রীতি-নীতির অন্যথা না হয়। অলমিতি।

এই ইতির পরেও অন্য বিবৃতি আছে সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধ-বাদীদের। সেদিকে আছেন কালীনাথ রায় চৌধুরী, রামমোহন রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও আরো একাধিক ব্যক্তি। হিন্দুশাস্ত্র-প্রেমিকের চোখে যারা ধর্মদ্রোহী, যারা পরমপাপী, যারা হীনমনা। এঁদের বক্তব্য? এঁদের অভিযোগ?

মারাত্মক। মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে এঁরা চ'লে গেছেন বিষবৃক্ষের মূলে, সহমরণের গোড়ার কাহিনীতে। অধিকাংশ প্রধান হিন্দুপুরুষ স্ত্রীর প্রতি সন্দেহপরায়ণ। এরা বিশ্বাস করে না নারীচরিত্রের একাগ্রতায়, সতীত্বে। জীবিতাবস্থার কথা থাক, মৃত্যুর পরেও পত্নী যদি অন্যাসক্তা হয়—এই দুর্ভাবনায় এরা উদ্‌ভ্রান্ত। এই উন্মত্ত, সন্দিগ্ধচিত্ত পুরুষেরা ভাবলো, এমন কী ব্যবস্থা করা যায় যার ফলে স্বামীর মৃত্যুর পরে স্ত্রী বাসনা থাকলেও কোনোক্রমেই ব্যাভিচারিণী হ'তে পারবে না। কী উপায়? কী ব্যবস্থা?

নিষ্ঠুর উপায়, নির্মম ব্যবস্থা। সেই অধিকাংশ প্রধান হিন্দুপুরুষের দল প্রচার ক'রে বেড়ালো, স্বামীর মৃত্যুতে সতীসাধ্বী পত্নীমাত্রেরই সহমরণ কর্তব্য, যায় অবশ্যম্ভাবী ফল অক্ষয় স্বর্গলাভ। ক্রমে-ক্রমে দেশের শিরায়-শিরায় এই অন্ধ, বিষাক্ত বিশ্বাস ছড়িয়ে পড়লো, স্বামী-হীনা নারীর কাছে ধর্মরক্ষার শ্রেষ্ঠতম উপায় হচ্ছে সহমরণ। এই নীতি নাকি নতুন নয়। অতীতচলিত এই প্রথার সাক্ষী নাকি শাস্ত্র!

অথচ সৎশাস্ত্র বিচার করলে যথার্থ দেখা যায় কুত্রাপি সহমরণের পক্ষে কোনো অলঙ্ঘনীয় নির্দেশ নেই।

কিন্তু দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। ওরা খুঁজে-খুঁজে বের করলো দুর্বল শাস্ত্রের কতিপয় বচন। যেন ঐ বচনকটাই সর্বশাস্ত্রের একমাত্র আপ্তবাক্য।

এমন কি, উক্ত দুর্বল শাস্ত্রের বচনকেও সর্বত্র মেনে চলেনি দুরাত্মারা। বচনে স্পষ্ট আছে, সহমরণ আপন ইচ্ছা-অনিচ্ছার ব্যাপার। কিন্তু দুরাত্মার দল বহুস্থানে মেয়েদের চিতায় বেঁধে দিয়েছে, ঢেকে দিয়েছে রাশি-রাশি কাষ্ঠতৃণস্তূপে, যাতে আকাঙ্ক্ষা হ'লেও মেয়েরা

চিতাশয্যা ছেড়ে পালাতে না পারে। বলা বাহুল্য হবে না, ঘটনা-ক্ষেত্রে পুলিশের উপস্থিতির ফলে সম্প্রতি একাধিক বিধবা কিঞ্চিৎ দগ্ধদেহে চিতা থেকে পালিয়ে আপন প্রাণ রক্ষা করেছেন। চিতার কাছে এসে ফিরে গেছেন বহু বিধবা। আজীবন ভরণ-পোষণের অঙ্গীকার পেয়ে সম্প্রতি বহু নারী পরিত্যাগ করেছেন সহমরণের ইচ্ছা, উপেক্ষা করেছেন সমাজের আত্মীয়-বান্ধবের নির্লজ্জ বিদ্রূপ।

বিধবাদের অবশ্যই আত্মঘাতিনী হ'তে হবে, হিন্দুধর্মশাস্ত্রের কুত্রাপি এমন অনুশাসন নেই। বিধবারা ব্রহ্মচর্যানুষ্ঠানে কালযাপন করবে, একথা সর্বশাস্ত্রসিদ্ধ। শাস্ত্র বলে, ব্রহ্মচর্যব্রত মুখ্যকল্পরূপ। অভ্রান্ত প্রমাণ আছে, সত্যযুগে বহুবিধবা ব্রহ্মচর্যব্রতচারিণী ছিলেন।

এখন সাহেব যেন দয়া ক'রে এ-বিষয়ে হুকুম দেবার আগে একবার হিন্দুনারীর প্রাণরক্ষার কথাটা বিবেচনা ক'রে দেখেন।

শত হ'লেও বেন্টিঙ্ক খোদ সাহেবের বাচ্চা। তার হুকুম বড়ো খারাপ। সতীদাহপ্রথা বিলুপ্তির দিকে সাহেবের চোখ।

গেলো, গেলো, সব গেলো। ধর্ম গেলো, শাস্ত্র গেলো, সতীত্ব গেলো। হতাশায় মুহ্যমান হ'য়ে পড়লো সহমরণের পক্ষপাতীরা। অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, পাণ্ডিত্যগর্বী। জোট পাকিয়ে সটান চলে এলো সাহেবের কাছে। সাহেব যদি আবার দয়া ক'রে সহমরণের বিষয়টা বিবেচনা ক'রে দেখেন, এই মর্মে একখানা দরখাস্ত পর্যন্ত দাখিল করলো।

কিন্তু সাহেবের বাচ্চা বেন্টিঙ্ক অন্য ধাতুতে গড়া। ওসব চলবে না। প্রয়োজন হ'লে তোমরা আপীল করতে পারো বিলেতে, রাজদরবারে।

এই ধর্মপ্রেমিকেরা অতঃপর মনের দুঃখে ঝেড়ে কটুবাক্য ছড়াতে লাগলো বিপক্ষ দলের উদ্দেশ্যে, যার মধ্যে আছেন কালীনাথ রায় চৌধুরী, রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও আরো একাধিক ব্যক্তি। ধর্মদ্রোহী, পরমপাপী, হীনমনা।

কেউ কি এসব কটুভাষণের যথাযোগ্য উত্তর দেবে না? দেবে। ইতিহাস দেবে। বর্তমান কাল না দিলেও উত্তরকাল দেবে।

পাঁচ

রামমোহন সম্পর্কে পূর্বাপর আরো কিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ ক'রে না রাখলে নিজের কাছে আমি গুরুতর অপরাধী হ'য়ে থাকবো। কিন্তু অপরাধীদের সংখ্যাবৃদ্ধিতে আমার উৎসাহ সামান্যতম। অতএব...

পিতৃকুল বিষ্ণুর উপাসক, মাতৃকুল শাক্তবংশ। বাবার নাম রামকান্ত রায়, মায়ের নাম তারিণী দেবী ওরফে ফুল ঠাকরুণ। স্বামিগৃহে এসে ফুলঠাকরুণ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিতা হলেন।

ফুলঠাকরুণের বাবার নাম শ্যাম ভট্টাচার্য। একবার রামমোহনকে নিয়ে বাপের বাড়ি বেড়াতে গেছেন ফুলঠাকরুণ। রামমোহন তখন শিশু।

পুজোর পরে একদিন শ্যাম ভট্টাচার্য সেই শিশুর হাতে পুজোর বেলপাতা দিলেন একটুকরো। শিশু তো, কী খেয়াল হ'লো কে জানে, বেলপাতা মুখে পুরে চিবুতে লাগলো।

ফুলঠাকরুণ এসে দেখেন—এই কাণ্ড। রামমোহন পুজোর বেলপাতা চিবুচ্ছে। বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিতা ফুলঠাকরুণের এই দৃশ্য সহ্য হ'লো না। এ যে ব্যাভিচার। ক্রোধে দিগ্বিদিক জ্ঞান রইলো না তার।

ছেলের মুখ থেকে বেলপাতা ফেলে দিলেন। ছেলের মুখ ধুইয়ে দিলেন। আর, আর যা করলেন, সেটা সাংঘাতিক কথা, বাপকে তিরস্কার করলেন এই অঘটনের মূল ব'লে।

শেষকালে কি না আপন মেয়ের মুখে তিরস্কার শুনতে হ'লো। শ্যাম ভট্টাচার্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। বললেন—তুই অহঙ্কার ক'রে পুজোর বেলপাতা ফেলে দিলি। তুই এই ছেলে নিয়ে কখনো সুখী হ'তে পারবি না। এই ছেলে তোর কালে বিধর্মী হবে।

লোকে বলে, শ্যাম ভট্টাচার্য বাকসিদ্ধপুরুষ। তার মুখে এই কথা? এই অভিসম্পাত? এই বজ্রশাপ?

তখন ফুলঠাকরুণ বাবার পায়ে ধ'রে কাঁদতে লাগলেন। বাবা, এই অভিশাপ তুমি ফিরিয়ে নাও, এই বাক্য তুমি ব্যর্থ করো।

শ্যাম ভট্টাচার্য বললেন—আমার বাক্য অব্যর্থ। তবে তোমার পুত্র রাজপূজ্য হবে, অসাধারণ হবে।

হলপ ক'রে বলতে পারি না, এসব পুরোপুরি সত্যি না গল্প। শুনতে পাই, বাড়ি ফিরে এসে ফুল ঠাকরুণ স্বামীর কাছে খুলে বললেন সব কথা। তারপর শৈশব থেকেই রামমোহনের দিকে প্রখর চোখ রাখলেন স্বামী-স্ত্রী। সবসময় সযত্ন, সতর্ক চোখ রাখতে হবে। দেখতে হবে, রামমোহন যেন কোনোদিন কোনোরকমে স্বধর্মপন্থা পরিত্যাগ না করে।

কিন্তু না, ভয়ের বোধ হয় তেমন কিছু নেই। আমাদের সনাতন ধর্মের প্রতি রামমোহনের অপরিসীম শ্রদ্ধা। ভাগবতের এক অধ্যায় পাঠ না ক'রে রামমোহন জলগ্রহণ করে না। গৃহদেবতা রাধাগোবিন্দের প্রতি তার যারপরনাই ভক্তি। তার বিষ্ণুভক্তি অসামান্য। এমন ভক্তি যে বাড়িতে মানভঞ্জন যাত্রা হ'তে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার চরণ ধ'রে কাঁদবে, শিখিপুচ্ছ পীতধড়া এই মর্ত্যের ধূসর ধূলায় লুণ্ঠিত—মানভঞ্জনের এই দৃশ্য রামমোহনের চোখের সামনে অভিব্যক্ত হবে? না, অসহ্য। না, ভয় নেই।

লেখাপড়া বাড়িতে যা হবার তা তো হ'লো, রামকান্ত রায় ন'বছর বয়সে ছেলেকে পাটনায় পাঠালেন। সেখানে দু'তিন বছর কাটলো। ফারসী আর আরবী শিখলো ভালো ক'রে। আরবীতে পড়া হলো ইউক্লিড আর আরিষ্টটল। আর কোরাণ। মনে লাগলো কোরাণের একেশ্বরবাদ।

তারপর রামকান্ত বারো বছর বয়সে ছেলেকে পাঠালেন কাশীতে। সেখানে সংস্কৃত। অল্পকালের মধ্যে আয়ত্ত হ'লো প্রাচীন আর্যশাস্ত্র। মনে থাকলো প্রাচীন আর্যশাস্ত্রের ব্রহ্মজ্ঞান।

বাড়ি ফিরে এসে রামমোহনের কেবল ধর্মচিন্তা। সেই একেশ্বরবাদ আর ব্রহ্মজ্ঞান তার মর্মমূলে নীড়নির্মাণ করেছে, তাকে প্রচলিত হিন্দু-ধর্মের প্রতি সন্দিগ্ধ ক'রে তুলেছে।

তখন পিতা-পুত্রে মতভেদ। দুই পুরুষের দ্বন্দ্ব। মধ্যে-মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হয়। ছেলের ভিন্নমতি দেখে রামকান্ত দুঃখিত হন, বিরক্ত হন।

'আমি আমার মতের স্বপক্ষে যে-কোনো যুক্তি বলি, তুমি প্রথমে একটি-কিন্তু-ব'লে তার উত্তর আরম্ভ করো।' —একদিন রামকান্ত একটু তিরস্কার করলেন রামমোহনকে। সচরাচর অধৈর্য হন না, মন দিয়ে ছেলের কথা শোনেন, সেদিন আর ধৈর্য রাখতে পারেন নি।

কিন্তু আগুনে ঘৃতাহুতি পড়লো আরেকদিন। ষোলোবছর বয়স তখন রামমোহনের। হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানা বই লিখলো—হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রণালী।

পিতা-পুত্রের মধ্যে সদ্ভাবের সামান্যতম সম্ভাবনাও আর রইলো না।

গৃহত্যাগ করলো রামমোহন। ষোলো বছরের ছেলে!

সেই বয়সে পরিব্রাজক হ'য়ে রামমোহন ভ্রমণ করেছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ, অধ্যয়ন করেছে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ।

কিন্তু শুধু ভারতবর্ষে ঘুরলেই কি হবে, হিমালয়ের উদ্ধত নিষেধ লঙ্ঘন করতে হবে না? হবে। তিব্বত যেতে হবে।

ভারতবর্ষ পরপদানত, ব্রিটিশ অধিকৃত। বিদেশী শাসনের প্রতি তার আন্তরিক ঘৃণা। রামমোহন স্থির করলো, ভারতবর্ষ ছেড়ে যেতে হবে। হিমালয় পেরিয়ে তিব্বতে।

সর্বত্র চোর-ডাকাতের ভয়, পথ বিঘ্নবহুল, বাঙালীর পক্ষে বিদেশ ভ্রমণ দুঃসাধ্য, আবালবৃদ্ধবনিতা কুসংস্কারাচ্ছন্ন, আর রামমোহনের বয়স ষোলো বছর, রামমোহনের সহায় নেই, সম্বল নেই।

কিন্তু সৎসাহসের কাছে পরাভূত হ'লো সর্ববিঘ্ন, রামমোহন গেলেন তিব্বতে। স্বজনহীন, বান্ধববর্জিত, আত্মীয়শূন্য দেশে। হয়তো শুধু দেশ-ভ্রমণ নয়, হয়তো, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই বৌদ্ধধর্মের তত্ত্বানুসন্ধানও তার লক্ষ্য।

তখন তিব্বতের অবস্থাটা কী? লামা সেখানে সর্বেসর্বা। একজন লামার মৃত্যু হ'লে আরেকজন বালককে লক্ষণ মিলিয়ে সবাই মিলে লামা বানায়। লামা কে? উনি এই সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টিকর্তা। উনি একজন অবতার। ওর মৃত্যু নেই। আছে শুধু দেহবদল।

উনি শুধু এক শরীর ছেড়ে আরেক শরীরে এসে আশ্রয় নেন। উনি লামা। উনি সর্বাধিপতি।

কিন্তু পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করবার জন্যে যে পিতৃগৃহ থেকে বিতাড়িত হয়েছে, ষোলোবছর বয়সে হিমালয় পেরিয়ে যে এসেছে এই দুর্গম দেশে, সে সহ্য করলো না তিব্বতের এই অন্ধবিশ্বাস। নির্ভয়ে প্রতিবাদ করলো এই বিষম কুসংস্কারের।

ধর্মের বিরুদ্ধে বাক্য বলছে? তবে আর কথা নেই, ওকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। তিব্বতের পৌরুষ ক্রোধে উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো। যেসব শাস্তির ব্যবস্থা তারা ঠিক করলো, সেটা ভাবা খুব কঠিন কথা নয়।

কিন্তু সেখানে রামমোহনকে রক্ষা করেছে তিব্বতরমণীরা। নর-তিব্বতের রোষবহ্নি থেকে তাকে বাঁচিয়েছে নারীতিব্বতের স্নেহচ্ছায়া। তিব্বতের কয়েকটি স্নেহ-কোমল নারী-হৃদয়ের স্নিগ্ধতা আজীবন রাম মোহনের স্মরণে অম্লান হ'য়ে থেকেছে। সেজন্যেই রামমোহন আমৃত্যু সমস্ত নারীজাতির প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করেছেন, শ্রদ্ধা অনুভব করেছেন। তাদের দুঃখে তিনি চিরকাল একান্তভাবে ব্যথিত হয়েছেন। কিন্তু সেসব কথা এখন থাক।

এদিকে রামকান্ত রায়েরও বুক ভেঙে গেছে। রামকান্ত বলেন—রামচন্দ্রকে বনে পাঠিয়ে রাজা দশরথের যে-অবস্থা হয়েছিলো, রামের শোকে আমারও সেই দশা। রামমোহনকে ঘরে ফিরিয়ে আনবার জন্যে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে লোক পাঠালেন রামকান্ত। চারবছর দেশ-ভ্রমণের পর তাদের একজনের সঙ্গে ঘরে ফিরে এলেন রামমোহন। রামকান্ত খুব খুশি হলেন। হারাধন ফিরে পেয়েছেন, ফুলঠাকরুণেরও আনন্দের সীমা নেই।

বাড়ি ফিরে এসে রামমোহন একাগ্র হ'য়ে পড়লো সংস্কৃতশাস্ত্র। স্মৃতি, পুরাণ।

সবই বুঝি ভালো লক্ষণ। মতিস্থির হয়েছে বুঝি এতদিনে। রামকান্ত মনে-মনে ভাবলেন। তাছাড়া তিন-চার বছর বিদেশ-বিভুঁয়ে ঢের কষ্ট পেয়েছে, যথেষ্টশিক্ষা হয়েছে নিশ্চয়ই। নির্ঘাত ছেলে এবার

শান্ত-শিষ্ট হ'য়ে সংসারে মন দেবে। বাপ-পিতামোর ধর্মের বিরুদ্ধে আর কথাটি কইবে না।

কিন্তু রামকান্তের ভাবনার মতো ফল হ'লো না। তর্ক-বিতর্কে রামকান্ত বুঝলেন, ছেলের মনোভাব আরেকরকম। শ্যাম ভট্টাচার্য বাকসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন, তার অভিশাপ বোধ হয় অব্যর্থ।

পৈতৃক ধর্মের কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে আবার উদ্দীপ্ত হ'লো রামমোহনের দুঃসাহস। পিতৃগৃহ থেকে আবার বিতাড়িত হ'লো রাম মোহন।

তারপর দীর্ঘকাল কাটলো কাশীধামে। সংস্কৃতশাস্ত্রচর্চায়।

রামকান্ত রায়ের মৃত্যুর পরে রামমোহন আবার ফিরে এলেন পিতৃগৃহে। শাস্ত্রাধ্যয়নে তখনো তার আশ্চর্য আসক্তি।

তার পাঠাসক্তির একটা গল্প আমি জানি।

পাঠের সময় কেউ যেন ব্যাঘাত না করে, বাড়ির সকলকে রামমোহন নিষেধ ক'রে দিয়েছেন। এ-নিষেধ অক্ষরে-অক্ষরে মাননীয়।

প্রাতঃস্নান সেরে একদিন রামমোহন নির্জন ঘরে ব'সে পড়তে সুরু করলেন বাল্মীকি রামায়ণ। বেলা বাড়ে, দুই প্রহর পার হ'য়ে যায়, রামমোহন প'ড়েই চলেছেন।

খাবার সময় হ'য়ে গেলো, রামমোহন তখনো মগ্ন। বাড়ির মধ্যে এমন সাহস কারো নেই যে পড়ার সময়ে রামমোহনের কাছে গিয়ে টু শব্দটিও করে।

সকলের খাওয়া-দাওয়া হ'য়ে গেলো, রামমোহন সেই রামায়ণ নিয়েই আছেন। তিন প্রহর বেলা হ'য়ে গেলো, কিন্তু রামমোহনের এখনো পড়া শেষ হয়নি। কে গিয়ে ভরসা ক'রে খেতে ডাকবে?

খাওয়া হয়নি শুধু ফুলঠাকরুণের। ছেলে অনাহারী থাকতে তিনি কেমন ক'রে আহার করেন!

রাধানগরের এক ভদ্রলোক—তার ওপর রামমোহনের খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা—সাহস ক'রে ঘরের দরজাটা একটু ফাঁক করলেন। তখন রামমোহনের খেয়াল হ'লো। কোনো কথা না ব'লে রামমোহন ইঙ্গিত করলেন। আরেকটু কাল!

আরেকটু পরে খেতে এলেন রামমোহন। একাসনে ব'সে এক-দিনে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ শেষ করেছেন রামমোহন।

কর্মপ্রার্থী হ'য়ে রামমোহন একদিন গেলেন সিবিলিয়ান ডিগবি সাহেবের কাছে। কেমন কর্ম চাই? সামান্য কর্ম, তুচ্ছ কেরানিগিরি।

সকলেই জানেন, কেরানি আর সাহেবদের সম্পর্ক খুব মধুরসাপ্লুত নয়। কথায়-কথায় মিথ্যে বলে কেরানিরা, তোষামোদ করে। তার ফলে যা পুরস্কার পাবার তাই পায় সাহেবদের কাছে। ঔদ্ধত্য, অভদ্রতা, অশিষ্টাচার। কেরানিরা যেন গোরু-ঘোড়া, যেন তারা ভদ্র-লোকের সন্তান নয়।

সব জেনেও রামমোহন এসেছেন। ডিগবি সাহেব রাজি হলেন। কেরানির চাকরি দেবেন তিনি রামমোহনকে।

কিন্তু রামমোহনের একটা সাংঘাতিক সর্ত আছে।

কাজের জন্যে রামমোহন যখন সাহেবের কাছে আসবেন, তখন তাকে বসতে আসন দিতে হবে। সাধারণ আমলাদের প্রতি যে-ভাবে হুকুমজারি করা হয়, তার প্রতি সে-রকম করা চলবে না। মনে রাখতে হবে কেরানি গোরু-ঘোড়া নয়, ভদ্রসন্তান বটে।

ডিগবি সাহেব এই সর্তে রাজি। কিন্তু না, রামমোহন শুধু মুখের কথায় রাজি নন। এই মর্মে একটা লেখা-পড়া ক'রে তাতে সই ক'রে দিতে হবে সাহেবকে। তাই করলেন ডিগবি সাহেব।

বিদ্যাবুদ্ধির ক্ষুরধার নৈপুণ্য ছাড়াও কাজে-কর্মে রামমোহনের অসাধারণ যত্ন, অপরিমেয় উৎসাহ, অবিচলিত নিষ্ঠা। ডিগবি সাহেব রামমোহনকে ভালোবেসে ফেললেন। অল্পদিনের মধ্যেই পদোন্নতি হ'লো রামমোহনের। ছিলেন কেরানি, হলেন দেওয়ান। ডিগবি সাহেব আর রামমোহন। কালেক্টর আর দেওয়ান। কর্মস্থানে দু'জনের মধ্যে দুস্তর পার্থক্য, কিন্তু কালেক্টরি আর দেওয়ানির বাইরে দু'জনের আরেক সম্পর্ক। প্রগাঢ় বন্ধুত্বের সম্পর্ক। কতোদিন দু'জনে মিলে সাহিত্যচর্চা করেছেন! একজন আরেকজনকে বুঝিয়ে দিয়েছেন! কর্মোপলক্ষে ডিগবি সাহেবের সঙ্গে তিনজায়গায় ঘুরেছেন রামমোহন। রামগড়, ভাগলপুর আর রংপুর।

রামমোহনের বড়ো ভাইয়ের নাম জগন্মোহন। তার স্ত্রীর খুব প্রিয়পাত্র রামমোহন। রামমোহনও খুব ভালোবাসেন ভ্রাতৃবধূকে।

চাকরিতে বহাল হবার কিছুকাল বাদে একটা কাণ্ড হ'লো তাকে নিয়ে।

জগন্মোহন মারা গেলেন। অতএব, স্থির হ'লো, রামমোহনের সেই ভ্রাতৃবধূও যাবে সহমরণে। রামমোহন এলেন। অনেক বোঝালেন রামমোহন, কিন্তু কিছুতেই তাকে নিবৃত্ত করা গেলো না। সহমরণে যেতেই হবে।

ধূ-ধূ ক'য়ে চিতা জ্বলছে। সহগামিনী স্ত্রীর আর্তনাদ যাতে কেউ কণামাত্র শুনতে না পায়, নিশ্চয়ই সেই উদ্দেশ্যে প্রবল উদ্যমে বাদ্য হচ্ছে। প্রাণভয়ে চিতা থেকে উঠবার চেষ্টা করছে সহগামিনী, কিন্তু সাধ্য কি উঠবে। শ্মশানবন্ধুরা নির্দয়, নিষ্ঠুর হাতে বাঁশ চেপে ধরেছে তার বুকে।

সেই শ্মশানে, প্রচলিত লোকাচারের চক্রব্যূহে রামমোহন নিঃসঙ্গ, নিরুপায়। সেদিন তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, নারীহত্যার এই নির্মম প্রথা বিলুপ্ত ক'রে দিতে হবে। যতদিন তা না হয়, ততদিন তিনি অবিশ্রাম চেষ্টা করবেন সমস্ত প্রাণ ঢেলে। কিন্তু সেসব কথা তো আগেই লিখে ফেলেছি।

বিষয়কর্ম উপলক্ষে রংপুরে থেকেছেন বছর পাঁচেক, কিন্তু রামমোহন কখনো বিস্মৃত হননি আপন কর্তব্য। সন্ধ্যার পর বাড়িতে সভা বসাতেন। ধর্মালোচনা চালাতেন। সভাস্থ ব্যক্তিবর্গকে বুঝিয়ে দিতেন পৌত্তলিকতার অসারত্ব আর ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা।

তারপর রামমোহন একদিন চাকরিতে ইস্তফা দিলেন। এলেন নিজের দেশে। সকলকে বোঝাতে হবে পৌত্তলিকতার অসারত্ব আর ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা।

কিন্তু ঘরের মধ্যে মা যে প্রতিকূল। ফুলঠাকরুণ দিনে-দিনে বিরক্ত হচ্ছেন। ধর্মের থেকে তো আর সন্তানস্নেহ বড়ো নয়। ছী-ছি, তার গর্ভের সন্তান কি না শেষে পিতৃ-পুরুষের কুলে কালি দিলো। বিরুদ্ধাচরণ করলো পৈতৃক ধর্মের। এ-দুঃখ ফুলঠাকরুণ

কোথায় রাখেন ?

না, দুঃখে অভিভূত হ'লে চলবে না। আগে ধর্ম, পরে অন্য কথা। ধর্মদ্রোহী ছেলেকে ফুলঠাকরুণ সপরিবারে বাড়ি থেকে বের ক'রে দেবেন। দেবেন কি, দিলেন।

সপরিবারে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন রামমোহন। লাঙুলপাড়ার কাছাকাছি রঘুনাথপুর। লাঙুলপাড়া ছেড়ে এসে রঘুনাথপুরে এক শ্মশানভূমির ওপর বাড়ি তৈরী করলেন। সেই বাড়ির সামনে বানালেন একটি মঞ্চ। মঞ্চের চতুষ্পার্শে উৎকীর্ণ হ'লো কয়েকটি—'ওঁ তৎসৎ', 'একমেবাদ্বিতীয়ম'।

রামনগরের রামজয় বটব্যালের দলের খুব নাম-ডাক। ওর দলে চার-পাঁচ হাজার লোক আছে বৈকি।

তা সাহস বটে রামমোহনের, বটব্যালের এলাকায় এসেও কি না প্রচার করছে ঐসব আজে-বাজে কথা। হুঁ-হুঁ, বটব্যালকে চেনেনি এখনো।

খুব সকালে বটব্যালের লোক রামমোহনের বাড়ির কাছে এসে ক্রমাগত কুক্কুটধ্বনি করে। সন্ধ্যার পর রামমোহনের বাড়ির মধ্যে ছুঁড়ে দেয় গোরুর হাড়। জঘন্য কাণ্ড সব।

বাড়ির সবাই ব্যতিব্যস্ত, কিন্তু রামমোহনের কিছুতেই ধৈর্যচ্যুতি হয় না। না, কোনো প্রতিহিংসা না। সদ্ভাব দ্বারা জয় করতে হবে অসদ্ভাবকে। ভালো কথায় আর সদুপদেশে অন্যের অন্যায় ভুলিয়ে দিতে হবে।

কিন্তু বটব্যালের লোক ওসবে ভোলে না। এত অত্যাচারও যখন রামমোহন নিঃশব্দে স'য়ে যাচ্ছে, তখন উৎপাতের মাত্রা আরো বাড়াও। আরো জ্বালাও।

ছয়

সব ছেড়ে যখন কলকাতায় এলেন, তখন রামমোহনের বয়স বিয়াল্লিশ। মাণিকতলায় থাকেন। মনের মধ্যে একমাত্র বাসনা, জন্মভূমির কল্যাণ। তার জন্তে অকাতরে উনি রাত্রিদিন পরিশ্রম করতে প্রস্তুত। জন্মভূমির হিতার্থে উনি আপন অর্থ ও অবকাশ, শরীর ও মন—আপন সত্তার সর্বস্ব উৎসর্গ ক'রে যাবেন।

তা উনি তো এলেন, কিন্তু কলকাতার হালচাল কেমন ?

ছুর্গোৎসবের বলিদান, নন্দোৎসবের কীর্তন, দোলযাত্রার আবির, রথযাত্রার গোল—এসব নিয়ে কলকাতার হিন্দুরা মহামত্ত। তীব্র পাপ থেকে পরিত্রাণ চাও ? পুণ্য চাও ? তাহ'লে গঙ্গাস্নান করো, ব্রাহ্মণবৈষ্ণবে দান করো, তীর্থভ্রমণ করো। উনি স্বপাকহবিষ্য ভোজন করেন ? তবে আর বলতে হবে না, ওর চিত্ত নিশ্চয়ই অতিশয় পবিত্র। ব্রাহ্মণ হচ্ছে বর্ণের গুরু। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছেয় কোনো-কোনো ব্রাহ্মণকে পর্যন্ত ম্লেচ্ছ ইংরেজের অধীনে বিষয়কর্ম করতে হচ্ছে, ছুপুর কাটাতে হচ্ছে ম্লেচ্ছ সংস্পর্শে।

কিন্তু এর কি কোনো প্রতিকার নেই ? অবশ্যই আছে। এই ব্রাহ্মণেরা বিকেলবেলা কাজ থেকে ফিরে এসে অবগাহন স্নান সেরে সান্ধ্যপূজাদি করেন; তারপর আহার করেন দিবসের অষ্টমভাগে। ব্যস্, সব দোষ কেটে গেলো। এতেই এরা সর্বজনপূজ্য, এতেই বহুজন এদের যশ প্রচারে পঞ্চমুখ।

তা সকল চাকুরে ব্রাহ্মণের তো শরীরের তেমন অবস্থা নয় যে নিত্যি বিকেলে জলে নেমে গঙ্গাস্নান করবেন। তাদের আরেক রকম ব্যবস্থা। তারা কাজে যাবার আগেই সাঙ্গ ক'রে যান সন্ধ্যাপূজা, হোম। আর ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের নিয়মিত নিবেদন করেন নৈবেদ্য এবং টাকাকড়ি। এই নিবেদনই বুঝি ম্লেচ্ছস্পর্শজাত পাপ খণ্ডনের অব্যর্থ মন্ত্র।

এই সব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মুখে-মুখে সব সমাচার পাওয়া যায়। সকালবেলা গঙ্গাস্নান সেরে এরা দরজায়-দরজায় ঘুরে বেড়ান আর দেশ-বিদেশের ভালো-মন্দ যাবতীয় সংবাদ পরিবেশন করেন।

শ্রাদ্ধে আর দুর্গোৎসবে অমুক-অমুক এত-এত দান করেছেন, বিস্তর পুণ্য করেছেন। অমুকের সঙ্গে কার তুলনা?

শুধু গদ্যে মন ওঠে না, সংবাদদাতা আস্ত একখানা সংস্কৃত শ্লোক ঝেড়ে ধনদাতার মহিমা কীর্তন করেন।

আর তমুক? তমুকের কথা আর বলবেন না মশাই। সে ব্যাটাচ্ছেলে একেবারে···

কারো প্রশংসার লোভ, কারো নিন্দার ভয়। লোভেই হোক আর ভয়েই হোক, অনেকেই যথেষ্ট দান করেন। সেসব দানের সামগ্রীতে ভর্তি হয় ঐসব আকাটমুখ্যুদের উদর।

কথায়-কথায় বেদের নাম করে, অথচ বেদের কটা বিন্দু এরা জানে, কটা বিসর্গ এরা চেনে? দিনে তিনবার ক'রে যে-সব সন্ধ্যার মন্ত্র এরা পড়ে, তার অর্থ এদের কজন জানে, শুনি?

আর বিষয়-আশয় যাদের আছে, তাদের তো বলতে গেলে বিদ্যাচর্চার কোনো বালাই নেই। চলতি বাঙলা ভাষার ব্যাকরণ তো দূরের কথা, বর্ণশুদ্ধি জ্ঞানটুকু থাকলেও না হয় বুঝতাম। বিষয়-কর্ম চালানোর মতো চিঠি-পত্র লেখা আর হিসেব চালানোর মতো অঙ্ক কষা—ব্যস্, এই যথেষ্ট। তবে এর উপরে যদি কেউ ইংরেজি অক্ষর ভালো ক'রে লিখতে পারেন তো তার কথা আলাদা। বিদ্যার গরিমায় তার কাছে ধরাও যা সরাও তা-ই।

বিদ্যাবিষয়ক শুষ্ক আলাপ-আলোচনায় কী হবে, চুটিয়ে চালাও আমোদ-আহ্লাদ, বাবুগিরি।

বাবুদের একটা বর্ণনা রাখি।

বাবুদের মাথায় ঢেউ-তোলা বাউরি চুল, দাঁতে মিশি, পরণে ফিনফিনে কালোপেড়ে ধুতি, অঙ্গে উৎকৃষ্ট মস্‌লিন্ বা কেমরিকের বেনিয়ান, গলায় উত্তম চুনট-করা উড়ুনি, পায়ে পুরু বগলস আঁটা চীনেবাড়ির জুতো। দিনের বেলায় বাবুদের অনেক কাজ—ঘুম, ঘুড়ি

ওড়ানো আর বুলবুলির লড়াই দেখা, কবি হাফ—আকড়াই পাঁচালি শোনা, সেতার-এস্রাজ-বীণ বাজানো। বাবুদের চোখে-মুখে নৈশপাপের কালিমাচিহ্ন সুস্পষ্ট।

কলকাতার এই আবহাওয়ায় হুলুস্থুল আনলো রামমোহনের কণ্ঠস্বর—পৌত্তলিকতা সারশূন্য, ব্রহ্মজ্ঞান প্রয়োজনীয়।

এ যে ধর্মদ্রোহ! এ যে সর্বনাশের ভূমিকা!!

প্রবল আন্দোলন উঠলো কলকাতায়। তার তরঙ্গে বিক্ষুব্ধ হ'লো সারা বাঙলাদেশ। বৈঠকখানায়, চতুষ্পাঠীতে—এমন কি অন্তঃপুরে পর্যন্ত সেই এক স্রোত, সেই এক কথা, সেই এক নাম। রামমোহন রায়! রামমোহন রায়!

রামমোহন রায় সারা দেশের শত্রু।

সাত

হিন্দুদের চক্ষুশূল রামমোহন কিন্তু পাদরীসাহেবদের কাছেও অতঃপর অপ্রিয় হ'য়ে উঠলেন।

পাদরীরা উঠে-প'ড়ে এক নাগাড়ে ব'লে যাচ্ছেন, হিন্দুধর্ম অতি কদর্য, খ্রীষ্টধর্ম সর্বোত্তম। অতএব, ভো ভো জনগণ, তোমরা সবাই গির্জায় এসো, খ্রীষ্টান হও। সভ্য হও।

হিন্দুর দেবদেবী আর মুনিঋষিদের নিন্দায় পাদরীরা পঞ্চমুখ।

পাদরীরা বলেন—তিনে মিলে এক ঈশ্বর। পিতা ঈশ্বর (পরমেশ্বর), পুত্র ঈশ্বর (যীশুখ্রীষ্ট) ও হোলিগোষ্ট (ধর্মাত্মা) ঈশ্বর। এই তিনে মিলে এক।

তিনে মিলে এক? কিন্তু রামমোহনের বদ্ধমূল বিশ্বাস—এই মত অযুক্ত, অসঙ্গত। এ-বিষয়ে রামমোহনের একটা রচনা আছে—

'এক খ্রীষ্টিয়ান পাদ্রি ও তাঁহার তিনজন চীনদেশস্থ শিষ্য, ইঁহাদের পরস্পর কথোপকথন।'

সেটা যতবার পড়ি ততবার আমার নতুন ক'রে ভালো লাগে। ভারি সুন্দর লেখাটা ঃ

পাদ্রি তিনজন শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে ভাই, ঈশ্বর এক কি অনেক?

প্রথম শিষ্য উত্তর করিল, ঈশ্বর তিন।

দ্বিতীয় শিষ্য কহিল, ঈশ্বর দুই।

তৃতীয় শিষ্য উত্তর দিল, ঈশ্বর নাই।

পাদ্রি। —হায় কি মনস্তাপ, শয়তানের অর্থাৎ অতি পাপকারীর ন্যায় উত্তর করিলে।

সকল শিষ্য।—আমরা জ্ঞাত নহি, আপনি এ ধর্ম্ম—যাহা আমারদিগকে

উপদেশ করিয়াছেন, কোথায় পাইলেন ; কিন্তু আমারদিগকে এইরূপে শিক্ষা দিয়াছেন, ইহা নিশ্চয় জানি।

পাদ্রি। —তোমরা নিতান্ত পাষণ্ড।

সকল শিষ্য। —আপনকার উপদেশ আমরা মনোযোগপূর্ব্বক শুনিয়াছি, এবং যাহাতে আপনকার নিন্দাকর হয়, এমত বাঞ্ছা রাখি না, কিন্তু আপনকার উপদেশ আমারদিগের আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছে।

পাদ্রি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া প্রথম শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আমার উপদেশ স্মরণ কর এবং কহ, তাহাতে কিরূপে তুমি তিন ঈশ্বর অনুমান করিয়াছ ?

প্রথম শিষ্য। —আপনি কহিয়াছিলেন যে, পিতাঈশ্বর ও পুত্রঈশ্বর এবং হোলিগোষ্ট অর্থাৎ ধর্ম্মাত্মা ঈশ্বর হয়েন। ইহাতে আমারদিগের গণনামতে এক, এক, এক, অবশ্য তিন হয়।

পাদ্রি। —আহা! আমি দেখিতেছি, তুমি অতি মূঢ়। আমার অর্দ্ধেক উপদেশ স্মরণ রাখিয়াছ। আমি তোমাকে ইহাও কহিয়াছিলাম যে, এ তিন মিলিয়া এক ঈশ্বর হয়েন।

প্রথম শিষ্য। —যথার্থ আপনি ইহাও কহিয়াছিলেন ; কিন্তু আমি অনুমান করিলাম যে, আপনকার ভ্রম হইয়া থাকিবেক। এ নিমিত্তে, যাহা আপনি প্রথমে কহিয়াছিলেন, তাহাকেই সত্য করিয়া জানিয়াছি।

পাদ্রি। —হা এমন নহে। তুমি তিন ব্যক্তিকে তিন ঈশ্বর করিয়া কখন বিশ্বাস করিবা না, এবং তাঁহাদিগের শক্তি ও প্রতাপ তুল্য নহে, এমত জানিও না, কিন্তু এ তিন কেবল এক ঈশ্বর হয়েন।

প্রথম শিষ্য। —এ অতি অসম্ভব, এবং আমরা চীনদেশীয় লোক, পরস্পর বিপরীত বাক্য বিশ্বাস করিতে পারি না।

পাদ্রি। ওহে ভাই! এ এক নিগূঢ় বিষয়।

প্রথম শিষ্য। —এ কি প্রকার নিগূঢ় বিষয়, মহাশয় ?

পাদ্রি। —এ নিগূঢ় বিষয় হয়। কিন্তু আমি জানি না কিরূপে তোমাকে বুঝাই এবং আমি অনুমান করি, এ গুপ্ত বিষয় কোনরূপে তোমার বোধগম্য হইতে পারে না।

প্রথম শিষ্য হাস্য করিয়া কহিল—মহাশয়, দশ সহস্র ক্রোশ হইতে

এই ধর্ম্ম আমারদিগকে উপদেশ করিতে প্রেরিত হইয়া আসিয়াছেন, যাহা বোধগম্য হয় না।

পাদ্রি। —আহা! স্থূলবুদ্ধির বাক্য এই বটে। চীনের দেশে প্রবল কলি আপন কর্ম্ম প্রকৃতরূপে করিতেছে। পরে, দ্বিতীয় শিষ্যকে কহিলেন যে, কিরূপে তুমি দুই ঈশ্বর নিশ্চয় করিলে?

দ্বিতীয় শিষ্য। —অনেক ঈশ্বর আছেন, আমি প্রথমতঃ অনুমান করিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি সংখ্যার ন্যূন করিয়াছেন।

পাদ্রি। —আমি কি তোমাকে কহিয়াছি যে, ঈশ্বর দুই হয়েন? সে যাহা হউক, তোমারদিগের মূঢ়তায় আমি এক প্রকার তোমারদিগের নিস্তার বিষয়ে নিরাশ হইতেছি।

দ্বিতীয় শিষ্য। —সত্য বটে, আপনি স্পষ্ট এমত কহেন নাই যে, ঈশ্বর দুই, কিন্তু যাহা আপনি কহিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই হয়।

পাদ্রি। —তবে তুমি এই নিগূঢ় বিষয়ে যুক্তি উপস্থিত করিয়া থাকিবে।

দ্বিতীয় শিষ্য। —আমরা চীনদেশীয় মনুষ্য, নানা বস্তুকে সাধারণে উপলব্ধি করিয়া পরে বিভাগ করি। আপনি এরূপ উপদেশ দিলেন যে, তিনব্যক্তি পৃথক্ পৃথক্ পূর্ণ ঈশ্বর ছিলেন, পরে আপনি কহিলেন যে, পশ্চিম দেশের কোন গ্রামে ঐ তিনের মধ্যে একজন, বহুকাল হইল মারা গিয়াছেন। ইহাতেই আমি নিশ্চয় করিলাম যে, এইক্ষণে দুই ঈশ্বর বর্ত্তমান আছেন।

পাদ্রি। —কি বিপদ! এ মূঢ়দিগকে উপদেশ করা পণ্ডশ্রম মাত্র হয়। পরে তৃতীয় শিষ্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন যে, তোমার দুই ভাই পাষণ্ড বটে, কিন্তু তুমি উহারদিগের অপেক্ষাও অধম হও। কারণ কোন আশয়ে তুমি উত্তর করিলে যে, ঈশ্বর নাই।

তৃতীয় শিষ্য। —আমি তিন ঈশ্বরের কথা শুনিয়াছি; কিন্তু তাঁহারা কেবল এক হয়েন, যাহা কহিয়াছিলেন, তাহাতেই বিশেষ মনোযোগ করিয়াছিলাম। ইহা আমি বুঝিতেও পারিলাম, অন্য কথা আমি বুঝিতে পারি নাই। আপনি জানেন যে, আমি পণ্ডিত নহি; সুতরাং যাহা বুঝা যায়, তাহাতেই বিশ্বাস জন্মে। অতএব, এই

অন্তঃকরণবর্ত্তী করিয়াছিলাম যে, ঈশ্বর এক ছিলেন এবং তাঁহার নাম হইতে আপনারা খ্রীষ্টিয়ান্ নাম গ্রহণ করিয়াছেন।

পাদ্রি। —এ যথার্থ বটে, কিন্তু ঈশ্বর নাই যাহা উত্তর করিয়াছ, তাহাতে অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছি।

তৃতীয় শিষ্য। —এক বস্তুকে হস্তে লইয়া কহিলেন যে, দেখ, এই এক বস্তু বর্ত্তমান আছে, ইহাকে স্থানান্তর করিলে, এ স্থানে এ বস্তুর অভাব হইবেক।

পাদ্রি। —এ দৃষ্টান্ত কিরূপে এস্থলে সঙ্গত হইতে পারে?

তৃতীয় শিষ্য। —আপনারা পশ্চিমদেশীয় বুদ্ধিমান্ লোক, আমারদিগের ন্যায় নহে, আপনকারদিগের দুরূহ কথা আমারদিগের বোধগম্য হয় না। কারণ, পুনঃপুনঃ আপনি কহিয়াছেন যে, এক ঈশ্বর ব্যতিরেকে অন্য ছিলেন না, এবং ঐ খৃষ্ট প্রকৃত ঈশ্বর ছিলেন। কিন্তু প্রায় ১৮০০ শত বৎসর হইল, আরবের সমুদ্রতীরস্থ য়ীহুদীরা তাঁহাকে এক বৃক্ষের উপর সংহার করিয়াছে। ইহাতে মহাশয়ই বিবেচনা করুন যে, ঈশ্বর নাই ব্যতিরেকে অন্য কি উত্তর আমি করিতে পারি?

পাদ্রি। —আমি অবশ্য ঈশ্বরের স্থানে তোমারদিগের অপরাধ মার্জ্জনার জন্য প্রার্থনা করিব। কারণ, তোমরা সকলে প্রকৃত ধর্ম্মকে স্বীকার করিলে না। অতএব তোমারদিগের জীবদ্দশায় এবং মরণান্তে চিরকাল যন্ত্রণায় থাকিবার সম্ভাবনা হইল।

সকল শিষ্য। —এ অতি আশ্চর্য্য, যাহা আমরা বুঝিতে পারি না এমন ধর্ম্ম মহাশয় উপদেশ করেন, পরে কহেন যে, তোমরা চিরকাল নরকে থাকিবে, যেহেতু বুঝিতে পারিলে না। ইতি।

তারপর রামমোহন বাইবেল থেকে খ্রীষ্টের উপদেশাবলী সঙ্কলন ক'রে একখানা বই বের করলেন—প্রিসেপ্ট্‌স্ অব্ যিশাস্, গাইড টু পিস্ এণ্ড হ্যাপিনেস্। সঙ্কলক হিসেবে নিজের নাম দেননি, কিন্তু সেটা চাপা রইলো না।

হিন্দুরা আগেই চটেছিলো। কিন্তু এর ফলে আবার নতুন ক'রে

কাটা ঘায়ে নুন পড়লো। এতদুর অধঃপতন। ছী-ছি, তুই কি না শেষে খ্রীষ্ট নিয়ে মাতলি!

পাদরীরাও বিষম বিরক্ত হ'লো।

শ্রীরামপুরের মার্শম্যান সাহেব তো ও-বইয়ের নিন্দা ক'রে কড়া একখানা প্রবন্ধই লিখলেন ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়ায়। আশ্চর্য, যীশুখ্রীষ্টের নামে বই অথচ তাতে লেখা হয়নি খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব, তাঁর অলৌকিক ক্রিয়া, তাঁর রক্তে পাপের পরিত্রাণ ইত্যাদি ইত্যাদি। বাইবেলের বাক্য যে ওসব মত প্রতিপোষক।

এই নিন্দাবাদের উত্তরে রামমোহন আরেকখানা বই বের করলেন—এন অ্যাপীল টু দি ক্রিশ্চিয়ান পাবলিক। তাতে লিখলেন যে ঈশ্বরের ত্রিত্ব, যীশুখ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব, খ্রীষ্টের রক্তে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি মত বাইবেলে নেই। তাহ'লে মিশনারিরা ওসব বিশ্বাস করেন কেন? তারও হেতু আছে। বাইবেলের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে না পেরেই মিশনারিরা···

সাংঘাতিক কথা। মার্শম্যান আবার তেড়ে উঠলেন। আবার রামমোহন লিখলেন—সেকেণ্ড অ্যাপীল টু দি ক্রিশ্চিয়ান পাবলিক।

তারপরেও মার্শম্যান আবার। কিন্তু তৃতীয়বার তার জবাব লিখে সে-বই ছাপাতে গিয়েই রামমোহন একটা ধাক্কা খেলেন।

এ-যাবৎ রামমোহনের বই ছেপেছে ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস। প্রেসের কর্তার কানে কোত্থেকে কী মন্ত্র এসেছে কে জানে, এবারে কর্তা রামমোহনের বই ছাপতে রাজি হলেন না। হবে না।

তা সেজন্যে থোরাই পরোয়া করেন রামমোহন। ধর্মতলায় নিজেই একটা প্রেস খুললেন—ইউনিটেরিয়ান প্রেস। সেখান থেকেই বেরুলো তাঁর—ফাইনাল অ্যাপীল।

স্বমত সমর্থনের জন্যে মার্শম্যান ইংরেজি বাইবেল থেকে যে-সমস্ত প্রমাণ তুলেছেন, রামমোহন তাতে সন্তুষ্ট নন। তিনি মূল গ্রীক আর হিব্রু বাইবেল থেকে আবশ্যিক অংশ নিজে ইংরেজিতে অনুবাদ করলেন। প্রমাণ করলেন— মার্শম্যান সাহেবের কথা-বার্তা তাঁর অবলম্বিত ধর্মশাস্ত্রসঙ্গত নয়।

মার্শম্যানের এই পরাজয়ে একটা হৈ-হৈ প'ড়ে গেলো। ইণ্ডিয়া গেজেটের ইংরেজ সম্পাদক পর্যন্ত লিখলেন, এ-দেশে রামমোহন এখনো তাঁর সমতুল্য লোক পাননি।

কিন্তু সবচেয়ে মজার কাণ্ড হয়েছে আড্যাম সাহেবকে নিয়ে। আড্যাম সাহেব একজন পাদরী। উনি এসেছিলেন বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রামমোহনকে ত্রিত্ববাদী খ্রীষ্টান করতে। দু'জনে মিলে আলাপ-আলোচনা চলে। শেষকালে হ'লো কি—উল্টো কাণ্ড—আড্যাম সাহেবই রাম মোহনের রাস্তা নিলেন। ত্রিত্ববাদ ছেড়ে আড্যাম নিজেই চ'লে এলেন একেশ্বরবাদের এলাকায়।

ইউনিটেরিয়ান কমিটি হ'লো। ওদের সামাজিক উপাসনার জন্যে একটা ঘর হ'লো ধর্মতলায়। আড্যাম সাহেব সেখানে আচার্য।

প্রথম পতিত মানব, স্বর্গচ্যুত মানবের নাম ছিলো আড্যাম। আর, গোঁড়া খ্রীষ্টানেরা বলতে লাগলো, এই আড্যাম হ'লো দ্বিতীয় পতিত মনুষ্য। সেকেণ্ড ফলেন্ আড্যাম!

সেই আড্যামের স্বর্গচ্যুতির মূলে ছিলো শয়তানের প্ররোচনা। এই আড্যামের অন্য পথে যাবার মূলে কার প্ররোচনা? কার?

আট

'হরকরা' পত্রিকার আপিস-বাড়ির দোতলায় ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি হ'লো। সোৎসাহে আড্যাম সাহেব খ্রীষ্টীয় একেশ্বরবাদ প্রচার করতে লাগলেন। ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টমতে ঈশ্বরের উপাসনা হয়।

তারাচাঁদ চক্রবর্তী আর চন্দ্রশেখর দেব—রামমোহনের দুই শিষ্য। সভান্তে ঐ সোসাইটি থেকে ফিরতি পথে একদিন তারাচাঁদ আর চন্দ্রশেখর রামমোহনকে বললো— বিদেশীদের উপাসনাস্থলে আমাদের যাওয়ার প্রয়োজন কি? আমাদের নিজের একটি উপাসনা গৃহ প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক।

কথাটা রামমোহন রায়ের মনে লাগলো। তারাচাঁদ আর চন্দ্রশেখর খাঁটি কথা বলেছে। নিজেদের একটা সভা…

সভা তো ছিলো একটা—আত্মীয় সভা। কলকাতায় এসে এক বছর পরেই রামমোহন স্থাপন করেছিলেন আত্মীয় সভা। তাঁর বাড়িতেই হপ্তায় একদিন সভা হ'তো। শিবপ্রসাদ মিশ্র বেদ পাঠ করতেন, গোবিন্দ মালা করতেন ব্রহ্মসঙ্গীত। কিন্তু রামমোহনের নামে সারা শহরময় তখন ঢি-ঢি। শুধু রামমোহন কেন, তাঁর সঙ্গীদের নিন্দায় পর্যন্ত তখন সারা শহর রসনামুখর। লোকের বিরাগ আর নিন্দা সহ্য করতে না পেরে তখন কয়েকজন পরিহার করেছেন রাম মোহনের সংসর্গ। একজন যেমন—জয়কৃষ্ণ সিংহ। উনি শুধু এদিক ছেড়ে গেলেও না হয় একরকম ছিলো। তা তো নয়, উনি গিয়ে যোগ দিলেন রামমোহনের বিপক্ষ শিবিরে। ব'লে বেড়াতে লাগলেন— আত্মীয় সভায় গো-বৎস হত্যা করা হয়।

কিন্তু কিছুতেই রামমোহন লেশমাত্র বিচলিত হননি। প্রতি-দিন পূর্বাহ্নে ও সায়াহ্নে পরমেশ্বরের উপাসনা করেছেন। যারা যাবার, তারা যাক। কিন্তু এমন কয়েকজন তো চিরকালই থাকবে যারা এখনো যায়নি, যারা কখনো যাবে না।

যাক গে। তারপর লাগলো মোকদ্দমা। সম্পত্তি থেকে রামমোহনকে বঞ্চিত করবার জন্যে তাঁর নামে মামলা করেছে গোবিন্দ, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র, জগন্মোহনের বড়ো ছেলে। আসলে ফুলঠাকরুণই গোবিন্দকে দিয়ে করিয়েছেন মামলা।

সেই মামলার হাঙ্গামায় রামমোহন নিজে সভায় উপস্থিত থাকতে পারতেন না, সভা হ'তে লাগলো কখনো বৃন্দাবন মিত্রের বাড়িতে, কখনো কালীশঙ্কর ঘোষালের বাড়িতে, কখনো বিহারী লাল চৌবের বাড়িতে।

এই বিহারীলালের বাড়িতেই একদিন বসেছিলো মস্ত বিচারসভা। একটা দিন গেছে বটে।

বিচার সভা—শাস্ত্রবিচার। রামমোহনকে পরাস্ত করবার জন্যে কতো কাণ্ড সেদিন। স্বয়ং রাধাকান্ত দেব বড়ো-বড়ো ভট্টাচার্য পণ্ডিত নিয়ে এসেছেন। জ্ঞানী-গুণী ধনী-পণ্ডিতে সভামণ্ডপ ভর্তি।

আসল কাণ্ড হয়েছিলো মাদ্রাজী পণ্ডিত সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর কথায়। তিনি বললেন—বাঙলা দেশে প্রকৃত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় না, সুতরাং এখানে বেদ পাঠ হওয়া উচিত নয়।

সভা স্তব্ধ। কেউ কোনো কথা বললেন না, কেউ কোনো প্রতিবাদ করলেন না। শেষে রামমোহন রায় বললেন। দু'জনে বাঁধলো ঘোরতর তর্ক। বাধ্য হ'য়ে সুব্রহ্মণ্য একসময় নিরস্ত হলেন। রামমোহন অপরাজেয়।

চকিতে কলকাতাময় একটা কথা ছড়িয়ে পড়লো—রামমোহনের অসামান্য ক্ষমতা। তবুও কিম্বা সেজন্যেই বুঝি রামমোহনের প্রতি হিন্দুসমাজের অসামান্য ক্রোধ, অসাধারণ বিদ্বেষ।

কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের সেই সম্পত্তি-সংক্রান্ত মামলা অনেকদূর গড়ালো। তা নিয়ে রামমোহন বিষম ব্যতিব্যস্ত। দু'বছর বন্ধ হয়েছিলো আত্মীয় সভা।

ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারার্থ বিধিমতো একটি সমাজ সংস্থাপন করবেন—এটা রামমোহনের বহুদিনের বাসনা। মামলা-মোকদ্দমার হাঙ্গামায় সে-বাসনা অপূর্ণ হ'য়ে আছে।

নিজেদের একটি উপাসনা গৃহ প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। খুব খাঁটি কথা বলেছে তারাচাঁদ আর চন্দ্রশেখর। কথাটা নিয়ে কয়েকজনের সঙ্গে পরামর্শ করলেন রামমোহন।

এ তো মহৎ উদ্দেশ্য। দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ মুন্সী, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর আর মথুরানাথ মল্লিক বললেন যে এর জন্যে তাঁরা যথাসাধ্য সাহায্য করবেন।

তখন আর কি। জোড়াসাঁকোয়, চিৎপুর রোডের উপর ফিরিঙ্গি কমললোচন বসুর বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানে স্থাপিত হ'লো উপাসনা সভা। তারাচাঁদ চক্রবর্তী সম্পাদক।

প্রতি শনিবার, সন্ধ্যে সাতটা থেকে ন'টা পর্যন্ত সভার কাজ। দু'জন তেলেগু ব্রাহ্মণ বেদ পাঠ করেন। উপনিষদ পাঠ করেন উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ। তারপরে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বৈদিক শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর সমাপ্তি সঙ্গীত।

অল্পদিন পরে—টাকাকড়ি জোগাড় হ'লো যখন—চিৎপুর রোডের পাশে জমি কেনা হ'লো। সেখানে উঠলো ব্রহ্মসমাজের বাড়ি।

সেই বাড়ির দরজা সকলের কাছে অবারিত। এখানে এসে শ্রদ্ধার সঙ্গে সবাই পরমেশ্বরের উপাসনা করতে পারে।

তবে এখানে কোনো ছবি, প্রতিমূর্তি বা খোদিত মূর্তি ব্যবহৃত হবে না। নৈবেদ্য না, বলিদান না, প্রাণিহিংসা না, পানাহার না। মনে রাখতে হবে, অন্য কোনো ধর্মের প্রতি বিদ্রূপ, অবজ্ঞা বা ঘৃণা প্রকাশের স্থান এটা নয়। যাতে প্রেম, নীতি, ভক্তি দয়া ও সততার পরিব্যাপ্তি হয়, যাতে সর্বধর্মের মানুষের মধ্যে ঐক্যবন্ধন দৃঢ়ীভূত হয়—এখানে শুধু তেমনি উপদেশ, তেমনি বক্তৃতা। এখানে সমস্ত সঙ্গীত ও প্রার্থনার লক্ষ্য সেই পরমেশ্বর—যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, পাতা, অনাদ্যনন্ত, অগম্য ও অপরিবর্তনীয়। তিনি নিরাকার, তিনি নামরূপাতীত। তিনি ত্রিগুণাতীত, তিনি সর্বব্যাপী। জলে-স্থলে-শূন্যে তিনি সমব্যাপ্ত। তিনি সব জানেন, কিন্তু তাঁকে কেউ জানে না।

তাঁকে জানো। তাঁকে ডাকো। তাঁকে ভাবো।

কিন্তু কেবল এই ব্রহ্মজ্ঞান নিয়েই তো নয়, সতীদাহ নিয়েও যে

বিষম বিবাদ। এই ব্রহ্মসভার পাল্টা আরেক সভা হ'লো, ধর্মসভা। রাধাকান্ত দেব ধর্মসভার সভাপতি, মতিলাল শীল প্রভৃতি শহরের নামজাদা ধনীরা সে-সভার উৎসাহী সভ্য। যেদিন যে-বাড়িতে ধর্মসভা বসে, তার প্রায় এক পোয়া পথ পর্যন্ত গাড়ি দাঁড়িয়ে যায়। ধর্ম-সভার লোকবল আছে, অর্থবল আছে, আড়ম্বরও আছে।

ব্রহ্মসভার সম্বল শুধু সত্য আর পরমেশ্বর। কিন্তু ব্রহ্মসভার দুর্নাম প্রায় সর্বত্র। ওখানে নাকি নাচগান হয়, রঙ্গতামাসা চলে, সবাই মিলে খানা-টানা খায়।

কেউ বলেন—ব্রহ্মসমাজ জ্বালিয়ে দাও। কেউ বলেন—রামমোহন রায়কে মেরে ফেলো।

হয়তো, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই সব কথা কানে যায়, কিন্তু মনে হয় রামমোহন এসব কথা যেন একেবারেই গ্রাহ্য করেন না। সঙ্গে কেউ থাক আর না-ই থাক, উনি মাণিকতলা থেকে হেঁটে আসেন সমাজে, গম্ভীর, উপাসনা ক'রে যান।

দেখে-শুনে অনেকে বলতে লাগলো—ব্রহ্মসভা আর বেশিদিন থাকবে না।

থাকবে না? কিন্তু কে বলতে পারে, কাল কী থাকবে না আর চিরকাল কী থাকবে!

বেণ্টিঙ্কের হুকুমে সতীদাহ রহিত হ'য়ে গেলো। টাউনহলে সভা ক'রে বেণ্টিঙ্ককে অভিনন্দিত করলেন রামমোহন। সভায় বাঙলা অভিনন্দন পত্র পাঠ করলেন কালীনাথ মুন্সী, ইংরেজি অভিনন্দনপত্র পাঠ করলেন হরিহর দত্ত।

প্রকাশ্য সভায় হরিহর বললো—সতীদাহ রহিত হওয়ায় এ-দেশের বিশেষ কল্যাণ হয়েছে।

সভাস্থ এক ব্যক্তি হরিহরের মুখনিঃসৃত এই কল্যাণ-বাণীটি অবিলম্বে এনে পৌঁছে দিলো তারাচাঁদ দত্তের কানে। তারাচাঁদ দত্ত সঙ্গে-সঙ্গে দারোয়ানকে হুকুম দিলেন—হরিহরকে বাড়িতে ঢুকতে দিও না।

যখন বাড়ি এলো, দারোয়ান হরিহরকে কর্তার হুকুম জানিয়ে দিলো।

হরিহর বললো—তুমি বাবাকে বলো আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই

কথাটা দারোয়ান বললো গিয়ে কর্তাকে। তখন তারাচাঁদ দত্ত বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।

হরিহর বাবাকে জিজ্ঞেস করলো—আপনি কি অপরাধে আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন?

তারাচাঁদ বললেন—তুমি কি টাউনহলের সভায় বলেছো, সতীদাহ রহিত হওয়ায় এ-দেশের বিশেষ কল্যাণ হয়েছে?

হরিহর স্বীকার করলো। হ্যাঁ, বলেছি।

—তবে তুমি আমার বাড়িতে স্থান পাবে না। যেখানে খুশি চ'লে যাও।

হরিহর চ'লে এলো মাণিকতলায়, রামমোহনের কাছে। সব শুনে রামমোহন হেসে উঠলেন। বললেন—তোমার আর আমার এক দশা। আমাকেও আমার বাবা তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তোমাকেও তোমার বাবা তাড়িয়ে দিয়েছেন। তবে তোমার কোনো ভাবনা নেই। তুমি ভালো লেখাপড়া জানো, আর আমারও অনেক বড়ো-বড়ো সাহেবের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় আছে। ভালো চাকরি ক'রে দিতে পারবো তোমার।

কিন্তু ভাগ্যের কী বিচিত্র পরিহাস।

হিন্দু-কালেজ সংস্থাপন নিয়েই কাণ্ডটা ঘটেছিলো। এ-দেশের ছেলেদের ইংরেজি শেখার একটা উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্যে বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় অনেক চেষ্টা করেছেন। ওর চেষ্টাতেই একদিন শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সমবেত হলেন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার্ এডওয়ার্ড হাইড ঈষ্টের কুঠিতে। ঘরোয়া বৈঠক।

এই ঘরোয়া বৈঠক পর্যন্ত এগোতো কি না সন্দেহ, যদি বৈদ্যনাথ মুখুয্যে না থাকতেন। আর বৈদ্যনাথ কিন্তু বরাবর বলেন—এ-ব্যাপারে তাঁকে সমস্ত উপদেশ আর উৎসাহ দিয়েছেন দু'জন—ডেভিড হেয়ার আর রামমোহন।

তা বৈঠকে তো কাজের কথা সুরু হ'লো। মোটামুটি হিসেব

হ'য়ে আছে—এই লাখ খানেক টাকার মতো হ'লেই আরম্ভ করা যাবে। আর যারা ডোনেশান দেবেন, তাদের ভেতর থেকে লোক নিয়েই অর্গানাইজিং কমিটি গঠিত হবে।

এখন ডোনেশানের প্রশ্ন।

রাধাকান্ত দেব কতো?

দশহাজার টাকা দেবেন।

মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর?

উনিও দশহাজার।

মতিলাল শীল?

পাঁচহাজার।

জয়কৃষ্ণ সিংহ?

পাঁচহাজার।

রামমোহন রায়?

সঙ্গে-সঙ্গে ওদের দলের মুখপাত্র হ'য়ে আপত্তি তুললেন তারাচাঁদ দত্ত। না, এ-ব্যাপারে রামমোহনকে নিলে চলবে না। ধর্মত্যাগী, ভ্রষ্টাচারী, নাস্তিক, ম্লেচ্ছবাবু রামমোহন যদি অর্গানাইজিং কমিটির মেম্বর হন, তাহ'লে ওদের মতো সনাতনধর্মপ্রাণ পরমনিষ্ঠাবান আর্য-সন্তানেরা অগত্যা এই কলেজ বর্জন করতে বাধ্য হবেন।

রামমোহন অবশ্যি এক কথায় স'রে দাঁড়িয়েছেন। এখন কোনো তর্ক-বিতর্ক নয়, কলেজটা হোক, ইংরেজি শিক্ষার একটা ব্যবস্থা হোক দেশে।

'আমি কমিটিতে থাকলে যদি কলেজের লেশমাত্র অনিষ্টেরও সম্ভাবনা থাকে,' এ-ব্যাপারে রামমোহন বলেছিলেন ডেভিড হেয়ারকে, 'তাহ'লে আমি সে-সম্মানের প্রয়াসী নই।'

সেদিনের সেই প্রবলপ্রতাপান্বিত তারাচাঁদ দত্তের ছেলে এই হরিহর দত্ত। তাই ভাবি!

এদিকে শোনা যাচ্ছে ধর্মসভার দল নাকি খুব তোড়জোড় চালাচ্ছেন। সতীদাহ নিবারণের আইন রহিত করবার জন্যে ওরা বুঝি বিলেতে আপীল করছেন।

তা রামমোহনও বিলেত যাচ্ছেন। অনেকদিন আগেই যেতেন, কিন্তু তাহ'লে এদিকের ক্রিয়া-কাণ্ড যে কিছুই করা যেতো না। তাছাড়া টাকাকড়ির সমস্যাও আছে।

এমন সময় একটা সুযোগ পাওয়া গেলো।

দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় আকবরের ভারি দুরবস্থা। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বাদশাহের সঙ্গে সর্ত মেনে চলছে না। সন্ধিপত্রে বাদশাহকে যে-পরিমাণ বৃত্তি দেওয়ার চুক্তি ছিলো, তার থেকে কম দিচ্ছে গভর্ণমেণ্ট। ফলে, বাদশাহকে সপরিবারে অর্থকষ্ট পোয়াতে হচ্ছে, নানারকম অসুবিধা। সেজন্যে বাদ্‌শাহ ঠিক করেছেন, বিলেতের রাজসভায় একবার আবেদন ক'রে দেখবেন।

যোগাযোগ হ'য়ে গেলো। বাদশাহের দূত হলেন রামমোহন, 'রাজা' হলেন।

রামমোহন বিলেত যাবেন।

অ্যাঁ, হিন্দুসন্তান হ'য়ে অর্ণবযানারোহণে ম্লেচ্ছদেশে যাবে? ছ্যাঃ। আবার উদ্বেল হ'য়ে উঠলেন বাঙলা দেশের সনাতনধর্মী পরম নিষ্ঠাবান আর্যসন্তানেরা। আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে এক কথা—রামমোহন বিলেত যাবে!

বাদশাহের দৌত্য তো উপলক্ষ মাত্র, আসল লক্ষ্য দুটো। এক, ভারতবর্ষের ভাবী রাজশাসন ও ভারতবাসীদের প্রতি গভর্ণমেণ্টের ব্যবহার বিষয়ক সিদ্ধান্ত প্রণয়নের জন্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নতুন সনন্দ-সংক্রান্ত বিচার-বিবেচনা হবে। আর—

আর, দুই। সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে ধর্মসভা আপীল করেছে। তার শুনানি হবে প্রিভি কাউন্সিলে।

অতএব, রামমোহন বিলেত না গিয়ে কেমন ক'রে থাকেন?

নয়

বটতলার গলিতে কাশীনাথ মল্লিকের বাড়িতে ধর্মসভার বৈঠক বসেছে। ধর্মসভার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। সতীদাহ-নিবারক আইনের বিরুদ্ধে বিলেতে আর্জি পাঠাতে হবে আর বিধর্মীদের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে আচার-ব্যবহার, ধর্ম-কর্ম, হিন্দুয়ানা।

সভাস্থ সকলে 'সাধু, সাধু' ক'রে উঠলেন।

সতীপক্ষের আর্জির মুশাবিদাখানা উত্তম হয়েছে। তবু বোধ হয় এখানা একজন বিশিষ্ট ইংরেজকে দেখিয়ে নিলে আরো ভালো হবে। বেশ কথা, তাই হবে। সে-ভার নিলেন স্বয়ং রাধাকান্ত দেব।

কিন্তু আর্জি নিয়ে বিলেতে রাজদরবারে কাকে পাঠানো যায়? আচ্ছা, সেকথা একদিন গোপীমোহন দেবের বাড়িতে বৈঠকে বিবেচনা ক'রে স্থির হবে। সেই বৈঠকে থাকবেন মাত্র ছ'জন। কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেব, গোকুলনাথ মল্লিক, আশুতোষ দেব, শিবচন্দ্র দাস আর তারিণীচরণ মিত্র।

হাঁ, আরেকটা কথা। যে পর্যন্ত আর্জি বিলেত না যায়, তাবৎকাল প্রতি রবিবারে নিয়মিত ধর্মসভার বৈঠক বসবে কিন্তু। তবে আগামী রবিবার মহাবিষুব সংক্রান্তি, সেদিন বৈঠক বন্ধ।

আরো একটা বার্তা। যে-পুথিপত্রে হিন্দুধর্মবিরুদ্ধ একবিন্দু কথাও থাকে, তা যেন কেউ পয়সা খসিয়ে কিনে ফেলো না। না, ভুলেও না। পয়সা খসিয়ে দূরে থাক, মিনিমাগনায় দিলেও যেন সেসব বস্তু কেউ স্পর্শ না করে। সাবধান।

কিন্তু শুধু এসব করলেই চলবে? আর কিছু করতে হবে না?

হবে বৈ কি, ধর্মসভার জন্যে অবিলম্বে একখানা নিজস্ব পাকাপোক্ত বাড়ি চাই। বাড়ির জন্যে চাই অঢেল টাকা। টাকা কোথায়?

আছে। ধর্মপ্রাণ উৎসাহীরা চাঁদার খাতা বগলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন দিগ্বিদিকে।

ধর্মসভার কাজ চলছে পুরোদমে। একদিন সভায় রামকমল সেন বললেন—আপন ক্ষতি স্বীকার ক'রেও শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভার জন্যে যে পরিশ্রম করেছেন, সেজন্যে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

সভাস্থ সকলে 'সাধু, সাধু' ক'রে উঠলেন।

তারপর উঠলেন স্বয়ং বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই। বললেন—আমাকে ধন্যবাদ দেওয়ার কোনো কারণ নেই। আমার অবশ্য কর্তব্য করেছি, এতে আবার ধন্যবাদ কিসের? সন্ধ্যা-আহ্নিক করে ব'লে কেউ কি ধন্যবাদ পায় না পেতে পারে?

বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই যাই বলুন, মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের অন্য অভিপ্রায়। এমনি ধন্যবাদে সাধ মেটে না। মহারাজের বাসনা, আপাতত এই বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে গণ্যমান্যদের স্বাক্ষরযুক্ত একখানা প্রশংসাপত্র ছেপে বিলি করা হোক; পরে, ধর্মসভার বাড়িখানা প্রস্তুত হ'লে সেখানে এই বন্দ্যোপাধ্যায়ের একখানা প্রতিমূর্তি স্থাপন করা হবে।

আর্জির চমৎকার হিন্দী আর বাঙলা তর্জমা করেছেন তারিণীচরণ মিত্র। তাঁকে ধন্যবাদ।

আর্জির ইংরেজি মুশাবিদা করেছেন রাধাকান্ত দেব। তাঁকেও ধন্যবাদ।

আর্জিখানা সংশোধনার্থ জনৈক বিজ্ঞ ইংরেজের কাছে পাঠানো হয়েছিলো; তিনি সবিশেষ প্রশংসা করেছেন। আর এই আর্জি দেখে ফ্রেন্সিস বেথি ভরসা দিয়েছেন, ধর্মসভার প্রার্থনা পূর্ণ হবে।

ইংরেজি আর্জিখানা যে উত্তম হয়েছিলো, সে-বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। ডাক্তার লসিংটন সাহেব মুক্তকণ্ঠে বলেছেন যে, দি পিটিশন ইজ ওয়ান্ অব দি ক্লেভারেস্ট থিঙ্স্ আই এভার হার্ড।

কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হ'লো না। চিরকালের মতো বন্ধ হ'য়ে গেলো সহদাহপ্রথা। যদিও প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না, তবু এ-ঘটনা আবার নতুন ক'রে সুপ্রমাণ করলো যে হৃদয়ের আবেদনের তুলনায় ভাষার চাতুর্য তুচ্ছাতিতুচ্ছ।

সহদাহপ্রথা বন্ধ হ'য়ে গেলো, কিন্তু তা ব'লে কি বন্ধ হ'য়ে যাবে ধর্মসভার ক্রিয়াকলাপ? কস্মিনকালেও না। আপাতত ধর্মসভার কর্তব্য হচ্ছে এমন ব্যবস্থা করা যার ফলে কেউ রামমোহন রায়ের মতস্থ লোকজনের ছায়া পর্যন্ত স্পর্শ না করে।

কিন্তু সে-গুড়েও বুঝি বালি পড়লো। একটা উদাহরণ তুলি।

ভগবতীচরণ মিত্র ধর্মসভার একজন প্রধান সাহায্যকারী। অথচ, অভাবনীয় কাণ্ড, তিনি নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন একজন সতী-দ্বেষীর সঙ্গে। এখন ব্যবস্থা?

যে-ব্যবস্থাই হোক, মিত্রমশায়ের কিছু যায়-আসে না। তার অর্থ আছে, সামর্থ্য আছে। তিনি এদের কারো কাছে একটা তিলেরও প্রত্যাশী নন, তিনি ভাগ্যবান। কার এমন সাধ্য যে তার বিরুদ্ধে ফাস্থুর-ফুস্থুর করে?

অন্তত ধর্মসভার সাধ্য নয়। ধর্মসভা দলাদলি ক'রে শুধু দুর্বল গরীব বামুন-পণ্ডিতের দুর্ভোগ বাড়াতে পারে।

সকলেই আড়ালে সাহেবদের নিন্দা করে। বলে—ওদের জন্যেই পতিপ্রাণা হিন্দুসতীদের ধর্মটা গেলো।

অথচ একজনকেও মুখ ফুটে কোনো সাহেবকে সামনাসামনি একথা বলতে শুনলাম না!

বরং ওদের অনেকেই দোল-দুর্গোৎসবে সাহেবকে নেমন্তন্ন ক'রে মহাসমাদরে বাড়ি নিয়ে আসে। হেঁ-হেঁ করে, হাত কচলায়। কার এমন বুকের পাটা যে সাহেবকে বলবে—তুমি আমাদের ধর্মদ্বেষী?

পাগল, ওকথা কি বলা যায়। বললে যদি সাহেব চটে-মটে মাইনে কেটে দেন!

মুখে কিছু বলা না যাক, কলমে অনেক কিছু লেখা যায়। কলমের অসামান্য শক্তি। সামান্য একটা ঘটনাকে চন্দ্রিকা-সম্পাদক এন্তার রঙ চাপিয়ে যা বানিয়ে ছেড়েছেন তার তুলনা হয় না।

ওলাওঠা বিষম সংক্রামক ব্যাধি। ও-ব্যাধিতে একদিনে পর্যন্ত একেকটা পরিবারও সাফ হ'য়ে যেতে পারে। ঘটনাচক্রে, হুগলিজেলার সুখরিয়া গ্রামে জগন্মোহন যোগী আর তার স্ত্রী একদিনে একটু আগে-

গিছে মারা গেছে। ব্যস্, চন্দ্রিকা-সম্পাদক খবর পেয়ে স্বামী-স্ত্রীর মুখে সংলাপ জুড়ে দিব্যি একখানা সম্পাদকীয় প্যাঁচ কষেছেন।

জগন্মোহনের স্ত্রী মরণোন্মুখ স্বামীর কাছাকাছি হ'য়ে বললো—হে প্রভু, আপনি তো চললেন, এখন আমার ধর্মরক্ষার উপায় কী?

ধর্মরক্ষা মানে সহমরণ। আইনে বারণ। অতএব জগন্মোহন বললো—আমার সাধ্য কী, বলো। দেশাধিপতির অন্যায় শাসনে…

মানে, আইনে বারণ। উপায় নেই—তবে?

স্ত্রী বললো—তবে তোমার ঐ ব্যাধি ঝটিতি আমার হোক।

স্বামী বললো—তথাস্তু।

বলামাত্র একবার ভেদ হ'য়ে স্ত্রীর নাড়ি ছেড়ে গেলো। তখন আর সহমরণে বাধা কিসের?

না, বাধা কিসের। সম্পাদকের কলমে এলেম থাকলে এমন কতো হয়।

আস্তে-আস্তে ধর্মসভা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে। এই ধর্মের কল ধর্মসভা বিকল হ'য়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

কিন্তু ধর্মসভার নিজস্ব বাড়ি তোলার নাম ক'রে যে গাদা-গাদা চাঁদা তোলা হ'লো, তার হিসেব কোথায়? হিসেব কে দেবে?

প্রমথনাথ দেব সভার ধনরক্ষক। তিনি স্বহস্তে কিছু খরচ করেননি এবং তার হাতে এক পয়সাও নেই। তিনি কিছু জানেন না।

সম্পাদক মশাই? না, তিনিও জানেন না। তিনি কি ধনরক্ষক?

আহা, অতোগুলো টাকা তবে গেলো কোথায়? গেলো কী ক'রে?

উড়ে। টাকার পাখা আছে যে!

দশ

যেমন মামা, তেমন ভাগ্নে। শ্রীগুরু আর গোপেশ্বর। নিবাস শান্তিপুর। শ্রীগুরুর প্রাণের ভাগ্নে গোপেশ্বর।

একবার দু'জনে এসে উঠলো এক গ্রামে, রীতিমতো ধনী জনৈক ভদ্রলোকের বাড়ি। বাড়ির কর্তা সত্যি-সত্যি ভদ্রলোক, দু'জনকেই তিনি 'আসুন, বসুন' করলেন।

এসে, ব'সে মামা পাড়লেন আসল কথা।—যদি ইচ্ছে করেন তো আমার সঙ্গের এই বামুনের ছেলেটিকে আপনি রাখতে পারেন। খাসা ছেলে। দিব্যি আপনার বিগ্রহসেবা, তারপর ধরুন, আরো ইদিক-উদিকের পাঁচ-দশটা কাজ-কম্মোও দেখতে পারবে। রাখবেন?

উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু বামুনের ছেলেটির জন্যে গাঁট থেকে কতো খসাতে হবে কে জানে। বরং একবার জিজ্ঞেস ক'রে ছাখা যাক। বাড়ির কর্তা তখন সবিনয়ে প্রশ্নটি পেশ করলেন।

তাহ'লে কর্তা টোপ গিলেছে, মামার আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু হাড়ঘুঘু লোক কস্মিনকালেও মনের আনন্দে দু'হাত তুলে নৃত্য করে না, চেপে যায়; অতএব মামাও আস্তে-সুস্থে বললেন—তা নিয়ে ভাবনা কিসের। আপনি বিজ্ঞব্যক্তি, যা হয় একটা ন্যায্যমূল্য দিয়ে আমাকে বিদেয় করবেন, বামুনের ছেলেটাকে দিয়ে যাবো আপনার হাতে। খাসা ছেলে, মশাই।

শেষপর্যন্ত রফা হ'লো একশো টাকায়। টাকা ট্যাঁকে গুঁজে মামা বিদায় নিয়ে চ'লে গেলেন, ভাগ্নে রইলো ভদ্রলোকের বাড়িতে বিগ্রহের সেবক হ'য়ে।

বিগ্রহসেবার সঙ্গে একে-একে আরো কাজ এসে জুটলো। ফুল তোলো, জল আনো, রান্না করো। কাটলো দু'মাস।

না, আর সহ্য হয় না। কিছু টাকাকড়ি বাগিয়ে পালাতে হবে।

চুরি ? থুঃ। গোপেশ্বর চুরি-ডাকাতি করে না। সে তেমন মামার ভাগ্নে নয়। বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ হাসিল করতে হবে।

পরদিন যথারীতি ফুল তুলতে বাগানে ঢুকলো গোপেশ্বর। বুদ্ধি খাটাতে আরম্ভ করলো। তারপর বাড়ির কর্তা দূর থেকে যে-দৃশ্য দেখলেন, তাতে তার বুকের রক্ত হিম হবার দাখিল। একেবারে ডাহা সর্বনাশের কাণ্ড!

এই ব্যাটাচ্ছেলেকে আগাম একশো টাকায় কিনে এখন বুঝি মান-সম্মান সব যায়। এই খবর জানাজানি হ'লে একঘরে হ'তে হবে, ধোপা-নাপিত বন্ধ হবে, মুখের ওপরে বন্ধ হ'য়ে যাবে আত্মীয়-কুটুমের দরজা, পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে একেবারে দেশান্তরী হ'তে হবে কি না তাই বা কে জানে। বাড়ির কর্তা মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়লেন। সর্বনাশ!

হ'লো কি ?

আর কি, সর্বনাশ হয়েছে। সকালবেলা বাগানের মধ্যে ঢুকে ঐ ব্যাটাচ্ছেলে কাছা খুলে পশ্চিমদিকে মুখ ক'রে নমাজ পড়ছে। ব্যাটা বামুনের ছেলে না কচু।

যাক, জানাজানি হবার আগে চুপে-চুপে ব্যাপারটা মিটিয়ে ওকে বাপু-বাছা বলে বিদেয় করতে পারলে বোধ হয় শেষরক্ষা হয়। দেখি।

বাগানফেরৎ গোপেশ্বরকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেলেন কর্তামশাই। নিচুগলায় বললেন—বাপধন, আমি সব দেখে ফেলেছি।

যেন কী একটা অতি গোপনীয় বস্তু প্রকাশ হ'য়ে গেছে, সারাশরীরে এমনি একখানা হতাশার ভঙ্গি করলো গোপেশ্বর।

—তুমি এখুনি এখান থেকে কেটে পড়ো। আর বাপধন, দয়া ক'রে মুখ বন্ধ ক'রে চ'লে যেয়ো। গাঁয়ের মধ্যে এই খবর ছড়িয়ে আমাকে ডুবিও না।

গোপেশ্বর মনে-মনে মামার মুখ স্মরণ করলো। শ্রীগুরুর মুখ।

—বেশ, আপনি তাহ'লে আমার মুখ বন্ধ ক'রে দিন।

—আমি তোমার মুখ বন্ধ করি কী ক'রে বাপু। তুমি নিজে যদি চুপে-চুপে…

—চুপে-চুপে আমাকে একশো টাকা দিলেই মুখ বন্ধ হ'য়ে যায় কর্তা।

বিপাকে পড়েছেন কর্তা, অতএব আরো একশো টাকা আক্কেল সেলামী দিতে হ'লো।

একশো টাকা ট্যাঁকে, আহ্লাদে আটখানা মুখে গোপেশ্বর সটান চ'লে এলো মামার আস্তানায়, শান্তিপুরে। এসেই হাঁক ছাড়লো— মামা, আমি এসেছি।

তখন দু'জনে পেল্লায় কোলাকুলি।

এই দুই সেয়ানের আরো বিস্তর কীর্তি-কাণ্ড আছে। ওদের ব্যবসাই এই, পরের মাথায় কায়দা ক'রে কাঁঠাল ভেঙে খায়। এ-লাইনে খুব নাম-ডাক ওদের।

কিন্তু অনেকদিন ওদের সম্পর্কে আর কোনো নতুন সমাচার শুনতে পাচ্ছি না।

শুনছি অন্য সমাচার। শুধু শুনছি কেন, দেখছিও।

হালে চুরি- ডাকাতি, খুন-খারাপি, দাঙ্গা-হাঙ্গামা যেন নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। পুলিশের নতুন বন্দোবস্ত হবার পর থেকেই চোর-ডাকাতের পোয়াবারো হয়েছে। অন্য জায়গার কথা কি, এই কলকাতায় যেসব বাড়িতে আগে কীট-পতঙ্গ পর্যন্ত ঢুকতে পারতো না, সেখানে এখন দিব্যি সিঁধ কেটে চোর ঢোকে। অথচ কস্মিনকালেও কলকাতায় সিঁধেল চোরের ভয় ছিলো না।

রাত্তিরে তবু এক কথা, দিন-দুপুরেও হামেশাই রাহাজানি হচ্ছে। টাকাকড়ি সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় বেরুলে পদে-পদে বিপদ, কখন এসে ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। রাস্তার ধারে বেণেদের দোকান থেকে ভরদুপুরে ডাকাতরা টাকা নিয়ে উধাও হ'য়ে যাচ্ছে।

কিন্তু চোর—ডাকাতের ভয় ছাড়াও অন্য ভয় আছে গৃহস্থের। আমলার ভয়, দারোগার ভয়। রাত্তিরে আমলা-চৌকিদারেরা যদি কখনো কাছাকাছি কোথাও ডাকাত পড়েছে শোনে, তাহ'লে তারা লম্বা পায়ে অকুস্থল থেকে সহস্র হস্ত দূরে পালায়। আসে পরদিন তদারকিতে। রাত্তিরে তাড়াতাড়িতে ডাকাত যা নিতে পারেনি, সেই

অবশিষ্টটুকু আমলা অম্লানবদনে আত্মসাৎ করে। ভীষণদর্শন সেজে এসে ডাকাত ডাকাতি করে রাত্তিরে। আর রক্ষাকর্তার সাজে এসে আমলা ডাকাতি করে দিনে।

নগদ টাকাকড়ি সমস্ত রাত্তিরে ডাকাতে নিয়ে গেছে? তাহ'লে বিষয়-সম্পত্তি বন্ধক রেখে থানার আমলাকে তুষ্ট করো। নতুবা নিস্তার নেই। আর কিছুতে যদি বাগে না পায় তো আমলার লোক তোমার বাড়িতে নির্ঘাত কোনো জিনিস লুকিয়ে রেখে অতঃপর থানা-তল্লাশীতে আসবে; বমাল গ্রেপ্তার ক'রে তোমাকে পাকাপাকি জেলের আসামী বানিয়ে দেবে।

আসল চোর-ডাকাতের পাত্তা নেই, দারোগার হাতে গ্রেপ্তার হয় অন্যজন। তাকে তালিমী সাক্ষীসমেত সদরে চালান ক'রে দিয়ে দারোগা তখন নিশ্চিন্তচিত্তে তাল ঠোকে, বগল বাজায়। যে যাই বলুক, সদরে তো জানলো দারোগা বহুৎ মেহনৎ ক'রে আসামী পাকড়াও করেছে। ব্যস্।

চোর-ডাকাত আর আমলা-দারোগার অত্যাচারে ভদ্রলোকের হাঁড়ির হাল হয়, চাষার হাল-গোরু যায়।

গ্রাম-গঞ্জ তো দূরস্থান, এই কলকাতায়ই বা সাধ্য কি যে কেউ সন্ধ্যের পর রাস্তা-ঘাটে নির্ভয়ে চলাচল করে। আর কিছু না থাক শীতকালে অনন্যোপায় পথচারীর গায়ে অন্তত একটু শীতবস্ত্র থাকেই। কিন্তু, থাকবে না। শাল হোক আর সুতিরই হোক, তাই গা থেকে কেড়ে নেবে গুণ্ডারা। তথাপি থানায় কেউ নালিশ জানাতে যায় না। মিছিমিছি হয়রাণি। ব'লে সিঁধের মধ্যে চোর ধরা প'ড়ে পর্যন্ত পুলিশের আইনে নিরপরাধ সাব্যস্ত হ'য়ে খালাস পাচ্ছে। তাদের কাছে এই গুণ্ডারা তো পরম সাধু।

কিন্তু এই আমলা-দারোগার ওপরে আছেন শাদা চামড়ার সাহেব। শেষ পর্যন্ত তাদের টনক নড়লো। না, এই দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুন-খারাপি অবিলম্বে দমন করতে হবে।

অতএব, ভরসা আছে। আর যাই হোক, সাহেবেরা মোসাহেবদের

কথায় কর্ম করেন না, চোখ মেলে দেখে-শুনে তারপর আপন কর্তব্য সম্পাদন করেন।

রাধা চন্দ্রের ভয়ে এ-জেলা ও-জেলা নদীয়া বর্ধমানের বুক কাঁপে। রাধা চন্দ্র দুর্ধর্ষ ডাকাতসর্দার একজন।

একবার ধরা পড়েছিলো রাধা সর্দার। কিন্তু ধন্য হিম্মত রাধা সর্দারের, বিচারের সময় অতগুলো লোকের চোখে ধুলো দিয়ে কাছারি থেকে পালিয়ে গেছে।

আরেকবার বেণীপুর থানার এমদাদ্ আলী দারোগা প্রায় চারশো লোক নিয়ে চিতারমার পুকুরের কাছে রাধা সর্দারকে ঘিরে ফেলেছিলো। কিন্তু রাধা সর্দার কাতান ধ'রে অবলীলায় ঐ ব্যূহ থেকে বেরিয়ে নদী সাঁতরে পালিয়েছে।

পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের হুকুম, অবিলম্বে রাধাকে গ্রেপ্তার করো। ইস্তাহার বেরিয়েছে, রাধা সর্দারকে ধ'রে দিতে পারলে দুশো টাকা পুরস্কার।

কিন্তু পুলিশের ইস্তাহার আর হুকুমে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে রাধা সর্দার কবিরহাটির গঞ্জে রাজকৃষ্ণ দে মশায়ের গোলায় ডাকাতি করেছে। সেখানে বল্লমের খোঁচায় খুন করেছে রূপচাঁদ চৌকিদারকে।

দিনে-দিনে পরাক্রম বেড়ে যাচ্ছে রাধা সর্দারের, সহ্যের শেষ সীমা অতিক্রম ক'রে যাচ্ছে তার দুঃসাহস। সরেজমিনে এলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব স্বয়ং হেনরি বেঞ্জিমন বেরাওনল্ড্। বিস্তর বিচার-বিবেচনার পর রাধা সর্দারকে গ্রেপ্তারের ভার দিলেন নাজির সেখ গোলামহোসেনকে।

সেখ গোলামহোসেন বিচক্ষণ ব্যক্তি। হৈ-চৈ না ক'রে তিনি সুলুকসন্ধান চালালেন সূক্ষ্ম রাস্তায়। রাধার দু'জন সাকরেদের সঙ্গে তিনি ভাব জমালেন, অশেষ আশ্বাস দিলেন তাদের, ব্যয়ব্যসনের ত্রুটি রাখলেন না। নাজিরের নজর বড়ো জোর, উনি এই দু'জন সাকরেদকে বিভীষণ বানিয়েই বুঝি রাধার ঘরভেদ করবেন।

নাজিরের পরামর্শে ঐ দু'জন সাকরেদ রাধাকে খবর পাঠালো, পাহাড়পুর গ্রামে একজন ধনী মুসলমানের বাড়িতে ডাকাতি করতে হবে। অতএব, পয়লা চেলা মধু মালাকে সঙ্গে নিয়ে সর্দার যেন

অতিসত্বর মাহমুদপুর গ্রামে রূপচাঁদ চন্দ্র মণ্ডলের বাড়িতে আস্তানা গাড়ে। দেরি হ'লে কিন্তু কাজ হাসিল হবে না।

ডাকাতির গন্ধ পেলে রাধা সর্দারের আর তর সয় না। দুই সাকরেদের সূত্রে খবর পেয়ে সর্দার চ'লে এলো মাহমুদপুরে, রূপচাঁদ চন্দ্র মণ্ডলের বাড়িতে।

যথাসময়ে নাজির গোলামহোসেন অল্প কয়েকজন চাপরাশি নিয়ে ঘিরে ফেললো রূপচাঁদ চন্দ্র মণ্ডলের বাড়ী। এবার বুঝি আর নিস্তার নেই।

নিস্তার না থাক, বিনাযুদ্ধে রাধা সর্দার হাত বাড়িয়ে দেবার বান্দা নয়। হাতে তলোয়ার নিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো, হাঁক ছাড়লো— ইয়া আলী!

মন্নু খাঁ হিন্দুস্থানি চাপরাশি, দেহে বিপুল তাগদ। সে-ও লাফিয়ে সর্দারকে নিয়ে পড়লো মাটিতে। অন্যান্য চাপরাশিরা তখন ধরাধরি ক'রে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেললো রাধা সর্দারকে।

হুগলির কাছারিতে রাধা সর্দার স্বীকার করলো তার পূর্বকৃত অজস্র ডাকাতির কাহিনী। নিজের কথা নিজের মুখেই খুলে বললো রাধা সর্দার। দশ-বারো বছর পর্যন্ত তার আবাস গাজিপুর জেলার ফিলথানায়; সেখানে তার পরিচয়—রাধানাথ বাবু। প্রতিবছর বর্ষা-কালান্তে এখানে এসে সদলে ডাকাতি ক'রে টাকাকড়ি রোজগার করে; তারপর গ্রীষ্মকালে চ'লে যায় আপন আবাসে, সেখানে থাকে তার একজন বিবাহিতা স্ত্রী, আরেকজন পরস্ত্রী।

বিচারে রাধা সর্দারের ফাঁসি হ'য়ে গেলো। তার ফাঁসি দেখবার জন্যে লোকে লোকারণ্য; বোধ হয় মহা-মহা বারুণী যোগে ত্রিবেণীতে ৺ভাগীরথী স্নানে কিম্বা ৺দফর খাঁ গাজি পীরের মেলাতেও তেমন ভিড় জমে না।

ডাকাত নয়, কিন্তু পূজোর চাঁদা আদায়ের নামে প্রায় ডাকাতি কাণ্ড করছে বেহালার কয়েকজন ভদ্রসন্তান। ওদের জন্যে বেহালার রাস্তায় কারো পথ চলবার জো নেই। বেহালার রাস্তায় পা দিয়েছো কি বারোয়ারি পূজোর চাঁদা দাও।

পুরুষদের কথা তবু ছেড়ে দিলাম, এরা স্ত্রীলোকদের পর্যন্ত মান-সম্মান রাখে না। কুলবধূ যাচ্ছে পাল্কিতে, বারোয়ারির দল রাস্তা আটকালো। ওদের ইচ্ছে মতো চাঁদা না দিলে পথ ছাড়বে না, উপরন্তু কুচ্ছিত কটু-কাটব্য করবে।

অনেক সময় এমন হয় যে কুলবধূর সঙ্গে নগদ টাকাকড়ি নেই, তখন অগত্যা অলঙ্কার পর্যন্ত গা থেকে খুলে দিতে হয়। উপায় কী।

সব শুনে চব্বিশ পরগণার ম্যাজিস্ট্রেট পেটন সাহেব রেগে একেবারে অগ্নিশর্মা হলেন। বেহালার এই দলকে আর বুঝি এক হাত না নিলে চলে না।

কিন্তু কিসের কী। বারোয়ারি দল যে—কে—সেই। আরেকখানা পাল্কি আসছে না?

হুঁ। পাল্কি আটকানো হ'লো বেহালার রাস্তায়। চাঁদা চাই। পাল্কির একজন বেহারা বললো—সঙ্গে কর্তা নেই, কুলবধূ একা যাচ্ছেন।

তাতে কী। চাঁদা চাই তবু।

—ওঁর সঙ্গে টাকা-পয়সা নেই।

যেন বললেই হ'লো একথা। বারোয়ারির পাণ্ডারা তখন বললো —তোদের বধূকে বের কর, তার সঙ্গে টাকা-পয়সা আছে কি না আমরা দেখবো।

—আমরা ডুলির ঘেরাটোপ ওঠাতে পারবো না; পারো তো ঘেরাটোপ উঠিয়ে তোমরা বধূর মুখ ছাখো।

তা-ও পারবে বারোয়ারির দল। ওরা কাউকে পরোয়া করে না।

কিন্তু ঘেরাটোপ তুলে ওদের হৃদ্‌কম্পের দাখিল। পাল্কি ছেড়ে মুহূর্তে দিগ্বিদিকে চোচা দৌড় লাগালো বারোয়ারীর পাণ্ডারা।

হয়েছে কি?

আর কি, কুলবধূ সেজে পাল্কির মধ্যে ব'সে আছেন স্বয়ং পেটন সাহেব।

ক্রমশ বহু দুর্বৃত্ত ধরা পড়ছে এখানে-ওখানে। বিচারে উচিত শাস্তি হ'য়ে যাচ্ছে একেকজনের।

সেদিন অবর একটা সাজার রকম দেখলাম ; বড়ো রঙের সাজা।

দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে ব্যাটাকে পরানো হ'লো চটের কৌপীন ; মাথায় কাগজের টুপি, গলায় জুতোর মালা, এক গালে কালি, আরেক গালে চুন। তারপর উল্টো গাধায় চড়িয়ে দু'দিকে দুই মেথর দাঁড়িয়ে চামরবৎ ঝাড়ুর বাতাস দিতে লাগলো। ঢেঁড়াওয়ালা ঢেঁড়া পিটিয়ে বীরবিক্রমে পথের লোকদের শোনাচ্ছে—এই মহাপ্রভুর কীর্তি-কাণ্ড। এইভাবে টহল মারতে-মারতে খিদিরপুর ঘুরে আলিপুরের আদালত হ'য়ে তবে ব্যাটা শেষ পর্যন্ত বিশ্রামের জন্যে আস্তানা পেলো। জেলে।

কতো দেশ-দেশান্তর, কতো সমুদ্রস্রোত পার হ'য়ে বিলেতের জাহাজ এসে ভিড়েছে বাঙলার উপকূলে। জাহাজ বোঝাই বিলেতি সুতো। বাঙলা দেশের হাটে-বাজারে ব্যবসা জমায় বিলেতি সুতো।

বাঙলা দেশের দীন-দুঃখীর ঘরে-ঘরে সুতো-কাটুনি মেয়েরা হাত গুটোয়, চরকার চাকা আস্তে-আস্তে স্তব্ধ হ'য়ে যায়। দু'বেলা দু'মুঠো শাকান্নের সুখ বুঝি আর রইলো না। ভগবান!

অথচ বিলেতি সুতো আমদানির আগে? গৃহকর্মের সঙ্গে সুতো কাটতো গরীবের ঘরের বৌ-ঝি। পুরুষের হাটে-বাজারে নিয়ে যেতো বিক্রীর জন্যে। তাঁতিরা আসতো ঘরের উঠোনে—কই গো মা, সুতো দাও।

তখন চরকার চাকার জোর ছিলো সংসারে।

কিন্তু এখন আর তাঁতির ছায়া পড়ে না ঘরের উঠোনে। হাটে-বাজারে গিয়ে দেখেছি, তাঁতিরা জমায়েৎ হ'য়ে বিলেতি সুতো কিনছে। বিলেতি সুতো ছেড়ে দিশি দ্রব্য কিনবে, দুনিয়ায় কে আছে এমন মহামূর্খ?

বাঙালী মেয়ের হাতের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে বিলেতি যন্ত্র। এগুলো বিলেতি যন্ত্রজাত সুতো। কিন্তু বাঙালী মেয়ে নিজের মন দিয়ে দুনিয়া মাপে। তাদের বিশ্বাস, এগুলো বিলেতি মেয়েদের হাতে-কাটা সুতো।

দীন-দুঃখী বাঙালী মেয়েরা কাউকে অভিশাপ দেয় না। আহা, বিলেতি মেয়েরাও কি কম দুঃখিনী?

কিন্তু ওরা কি কোনো উপায়েই এই সুতো এদেশে না পাঠিয়ে নিজের দেশের হাটে-বাজারে চালাতে পারে না?

হয়তো একবার সব অবস্থা খুলে ওদের অনুরোধ জানালে সুফল হ'তে পারে। কিন্তু বিলেত তো এখানে নয়। কাঁহা-কাঁহা মুল্লুক পেরিয়ে তবে সেই বিলেত। সেখানকার মেয়েদের অনুরোধ জানানো কি মুখের কথা?

একটা উপায় আছে বুঝি। শান্তিপুরের একটি সুতো-কাটুনি মেয়ে শুনেছে, সংবাদপত্রের সম্পাদক নাকি দয়া করলে বাঙলাদেশের মেয়েদের এই মর্মান্তিক অনুরোধটুকু যথাস্থানে নির্ভুল পৌঁছে দিতে পারেন। অতএব, সেই মেয়েটি একখানা পত্র পাঠালো সম্পাদককে।

সম্পাদকমশাই সেখানা ছেপে দিয়েছেন। সরল সুন্দর নিবেদনে, হৃদয়ের উদারতায়, ভালোবাসার ভাষায় রচিত একখানা মর্মস্পর্শী পত্র।

সেখানা হুবহু উদ্ধার ক'রে রাখি :

শ্রীযুত সমাচার পত্রকার মহাশয়।

আমি স্ত্রীলোক অনেক দুঃখ পাইয়া এক পত্র প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতেছি আপনারা দয়া করিয়া আপনারদিগের আপন ২ সমাচারপত্রে প্রকাশ করিবেন শুনিয়াছি ইহা প্রকাশ হইলে দুঃখ নিবারণকর্ত্তারদিগের কর্ণগোচর হইতে পারিবেক তাহা হইলে আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবেক অতএব আপনারা আমার এই দরখাস্তপত্র দুঃখিনী স্ত্রীর লেখা জানিয়া হেয়জ্ঞান করিবেন না।

আমি নিতান্ত অভাগিনী আমার দুঃখের কথা তাবৎ লিখিতে হইলে অনেক কথা লিখিতে হয় কিন্তু কিছু লিখি আমার যখন সাড়ে পাঁচ গণ্ডা বয়স তখন বিধবা হইয়াছি কেবল তিন কন্যা সন্তান হইয়াছিল। বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ী আর ঐ তিনটি কন্যা প্রতিপালনের কোন উপায় রাখিয়া স্বামী মরেন নাই তিনি নানা বাবসায়ে কালযাপন করিতেন আমার গায়ে যে অলঙ্কার ছিল তাহা বিক্রয় করিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধ করিয়াছিলাম শেষে অন্নাভাবে কএক প্রাণী মারা পড়িবার প্রকরণ উপস্থিত হইল তখন বিধাতা আমাকে এমত বুদ্ধি দিলেন যে যাহাতে আমারদিগের প্রাণ রক্ষা হইতে পারে অর্থাৎ আসনা ও চরকায় সুতা কাটিতে আরম্ভ করিলাম প্রাতঃকালে গৃহকর্ম্ম অর্থাৎ পাটি ঝাটি করিয়া চরকা লইয়া বসিতাম বেলা দুই প্রহরপর্য্যন্ত কাটনা কাটিতাম প্রায় এক তোলা সুতা কাটিয়া স্নানে যাইতাম স্নান করিয়া রন্ধন করিয়া শ্বশুর শাশুড়ী আর তিন কন্যাকে ভোজন করাইয়া পরে আমি কিছু খাইয়া সরু টেকো লইয়া আসনা সুতা কাটিতাম

তাহাও প্রায় এক তোলা আন্দাজ কাটিয়া উঠিতাম এই প্রকারে সূতা কাটিয়া তাঁতিরা বাটীতে আসিয়া টাকায় তিন তোলার দরে চরকার সূতা আর দেড় তোলার দরে সরু আসনা সূতা লইয়া যাইত এবং যত টাকা আগামি চাহিতাম তৎক্ষণাৎ দিত ইহাতে আমারদিগের অন্ন বস্ত্রের কোন উদ্বেগ ছিল না পরে ক্রমে ২ ঐ কর্ম্মে বড়ই নিপুণ হইলাম কএক বৎসরের মধ্যে আমার হাতে সাত গণ্ডা টাকা হইল এক কন্যার বিবাহ দিলাম ঐ প্রকারে তিন কন্যার বিবাহ দিলাম তাহাতে কুটুম্বতার যে ধারা আছে তাহার কিছু অন্যথা হইল না রাঁড়ের মেয়্যা বলিয়া কেহ ঘৃণা করিতে পারে নাই কেননা ঘটক কুলীনকে যাহা দিতে হয় সকলি করিয়াছি তৎপরে শ্বশুরের কাল হইল তাঁহার শ্রাদ্ধে এগার গণ্ডা টাকা খরচ করি তাহা তাঁতিরা আমাকে কর্জ্জ দিয়াছিল দেড় বৎসরের মধ্যে তাহা শোধ দিলাম কেবল চরকার প্রসাদাৎ এতপর্য্যন্ত হইয়াছিল এক্ষণে তিন বৎসরাবধি দুই শাশুড়ী বধুর অন্নাভাব হইয়াছে সূতা কিনিতে তাঁতি বাটীতে আসা দুরে থাকুক হাটে পাঠাইলে পূর্ব্বাপেক্ষা সিকি দরেও লয় না ইহার কারণ কি কিছুই বুঝিতে পারি না অনেক লোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছি অনেকে কহে যে বিলাতি সূতা বিস্তর আমদানি হইতেছে সেই সকল সূতা তাঁতিরা কিনিয়া কাপড় বুনে। আমার মনে অহঙ্কার ছিল যে আমার যেমন সূতা এমন কখন বিলাতি সূতা হইবেক না পরে বিলাতি সূতা আনাইয়া দেখিলাম আমার সূতাহইতে ভাল বটে তাহার দর শুনিলাম ৩।৪ টাকা করিয়া সের আমি কপালে ঘা মারিয়া কহিলাম হা বিধাতা আমাহইতেও দুঃখিনী আর আছে পূর্ব্বে জানিতাম বিলাতে তাবৎ লোক বড় মানুষ বাঙ্গালি সব কাঙ্গালী এক্ষণে বুঝিলাম আমাহইতেও সেখানে কাঙ্গালিনী আছে কেননা তাহারা যে দুঃখ করিয়া এই সূতা প্রস্তুত করিয়াছে সে দুঃখ আমি বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছি এমত দুঃখের সামগ্রী সেখানকার হাটে বাজারে বিক্রয় হইল না একারণ এ দেশে পাঠাইয়াছেন এখানেও যদি উত্তম দরে বিক্রয় হইত তবে ক্ষতি ছিল না তাহা না হইয়া কেবল আমারদিগের সর্ব্বনাশ হইয়াছে সে সূতায় যত বস্ত্রাদি হয়

তাহা লোক দুই মাসও ভালরূপে ব্যবহার করিতে পারে না পলিয়া যায় অতএব সেখানকার কাটনিরদিগকে মিনতি করিয়া বলিতেছি যে আমার এই দরখাস্ত বিবেচনা করিলে এদেশে সুতা পাঠান উচিত কি অনুচিত জানিতে পারিবেন।—

শান্তিপুর কোন দুঃখিনী সুতা কাটনির দরখাস্ত।

বার

সেদিন টাউন হলে গিয়েছিলাম।

সেখানে মস্ত সভা। উদ্দেশ্য মহৎ। পালে-পালে বিলেতের সাহেবেরা যাতে এদেশে এসে স্বচ্ছন্দে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কর্ম চালাতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুরা দলে-দলে এ-দেশের মাটিতে পদার্পণ না করলে উন্নতি হবে না আমাদের শিল্পের, ব্যবসার, অবস্থার। অতএব, এই মর্মে অবিলম্বে আবেদন জানাতে হবে পার্লামেন্টে। হুজুর, তাড়াতাড়ি গৌরাঙ্গ মাঝিমিস্ত্রিদের পাঠিয়ে দিন।

তারা এলে নাকি আমাদের সর্বসাধারণের সুখ বাড়বে, ঐশ্বর্য বাড়বে।

কিন্তু সর্বসাধারণের মনের কথা বুঝি আরেক রকম।

দলে-দলে নয়, মাত্র দু'দশ জন সাহেব এসে এদেশে শিল্প-বাণিজ্যের হাতে যে পর্বতপ্রমাণ সুখৈশ্বর্য উপহার দিয়েছে আমাদের, নির্ভুল হিসেব আছে তার সর্বসাধারণের পেটে, পরণে, মনে। উদাহরণ আছে সওয়া গণ্ডা।

কিছুকাল আগেও ইমারতির কাজে এখানে বিস্তর নাম-ডাক ছিলো সুলতান আজদ্দীন চাঁদ মিস্ত্রির। কিন্তু এখন আর সেদিন নেই; বিলেত থেকে এসেছে স্মাইলবরণকারিরা, ইমারতির সাহেব মিস্ত্রি। বানানো গল্পের মতো মনে হয় অথচ সত্যি-সত্যি ওরা এই কাজে এখানে উপায় করেছে লাখে-লাখে টাকা। এদিকে বহুৎ বাঙালী মিস্ত্রি অগত্যা ইমারতির কাজ ছেড়ে মাথায় পাগড়ি বেঁধে হাতে কোদাল নিয়েছে; কিন্তু কোদাল কুপিয়ে যে পয়সা ওঠে তাতে পেটের ক্ষিধে মেটে না। রোল্ট কোম্পানি প্রভৃতি এসেছেন, তার ফলে বাঙালী বাড়ুই মিস্ত্রির সুখের দিন চ'লে গেছে। মিঃ হেমিল্টন কোম্পানি প্রভৃতি এসেছেন, অতএব বাঙালী স্বর্ণকার ভুরি-ভুরি ধনোপার্জনের কথা স্বপ্নেও আর ভাবে না; প্রতি প্রাতে অন্নভক্ষ্যের কথা ভাবতে হয়। কেবল রমজান ওস্তাগর কেন, আরও কতো দরজী সূচের দৌলতে ভূমি-

সম্পত্তি পর্যন্ত করেছে। কিন্তু এখন মিঃ গিবসন কোম্পানি প্রভৃতির শুভাগমন হয়েছে। ফলে, সূচ্যগ্র ভূমিক্রয়ের চিন্তা পর্যন্ত আকাশের চাঁদের সামিল, শুধু শাকান্নের দুশ্চিন্তায় একেকজন দরজীর শরীর শুকিয়ে সূচ।

এমন কি, বোট আপিসও খুলেছেন সাহেবেরা। এ-দেশের নিরুপায় মাঝিরা জলের নৌকো ছেড়ে উঠে এসেছে পাড়ের মাটিতে। তাদের অজস্র নৌকো বুঝি মনের দুঃখে ভেসে-ভেসে জল হ'য়ে মিলিয়ে গেছে জলের নদীতে।

নদী নয়, সাহেবদের সঙ্গে আমাদের ব্যবধান সাতসমুদ্রের। কিন্তু বলতে গেলে যারা পাশের বাড়ির লোক আমাদের সঙ্গে তাদের ব্যবহারও বিচিত্র। মাড়োয়ারী মহাপ্রভুরা। কতো টাকা যে প্রভুরা গাঁট বেঁধে বাঙলা থেকে আপন দেশে নিয়ে যায় তার আর লেখা-জোখা নেই। অথচ ওরাই সবচেয়ে বেশি নিন্দা রটায় বাঙালীর নামে। মাতৃভাষায় ঝেড়ে কটুকাটব্য নিবেদন করে বাঙালীর উদ্দেশ্যে। বোধ হয় ওদের অভিধানে কৃতজ্ঞতা ব'লে কোনো শব্দ পর্যন্ত নেই।

সম্প্রতি উক্ত প্রভুরা জোর গলায় জাহির ক'রে বেড়াচ্ছেন, আমরা আর বাঙালী ক্ষুদে মহাজনদের সঙ্গে কারবার রাখবো না ; আমাদের সর্বনাশ হয়েছে, বাঙালী ক্ষুদে মহাজনদের সঙ্গে কারবারে আমরা দু'লাখ টাকা লোকসান দিয়েছি।

যদিও সব ব্যবসাই লাভ-লোকসানের খেলা, তবু সে-তত্ত্ব এখানে মুলতুবি রইলো। মাড়োয়ারী সাধুবাবাদের কাছে শুধু সবিনয়ে জানতে চাই—'ক্ষুদে মহাজনদের' আগে ঐ 'বাঙালী' বিশেষণটা সজোরে বলার হেতুটা কী? শুধু ক্ষুদে মহাজনদের সঙ্গে কারবার রাখবে না বলো, আপত্তি নেই। কিন্তু যে-বাঙালীর অর্থশোষণ ক'রে ওদের সমস্ত সমৃদ্ধি, বাঙলা দেশে ব'সে সেই বাঙালীর বিরুদ্ধেই মাড়োয়ারীরা সবচেয়ে উচ্চকণ্ঠ হবে—এটা কেমন কথা? স্বীকার করি, এক-আধজন বাঙালী ক্ষুদে মহাজন হয়তো ব্যবসাক্ষেত্রে অপরাধী। কিন্তু এক-আধজনের অপরাধে কি অপরাধী সাব্যস্ত হবে সমস্ত জাতি?

আরও অভিযোগ আছে মাড়োয়ারীদের বাঙালীর বিরুদ্ধে। মাড়োয়ারী মহাজনের কুঠিতে যে-সমস্ত বাঙালী পোদ্দার আছে, তাদের হাতে ব্যাঙ্কনোট ইত্যাদি পাঠাতে আর নাকি ওদের বিশ্বাস হচ্ছে না। ওদের চোখে সব মাথাখোলা বাঙালীরই একরকম চেহারা, ব্যাঙ্কনোট সমেত কে কখন উড়নি উড়িয়ে পগার পার হ'য়ে যায়, ঠিক কী।

বাঙালীর ওপর এমন প্রাণঢালা বিশ্বাস, তবু পোদ্দার রাখবার সময় ওরা বেছে-বেছে বাঙালীই রাখবে। অষ্টোত্তরশত নিন্দা সত্ত্বেও ওরা এক জায়গায় বাঙালীকে মস্ত সমীহের চোখে দেখে; বাঙালীরা বড়ো মাথা খোলা। আর কে না জানে পোদ্দারের কাজ মাথার কাজ; অনেক হিসাব-নিকাশ, বহুৎ যোগ-বিয়োগ, মেলা ঝামেলা। অতো ঝঞ্ঝাটে সামাল দেওয়ার মতো মাল বাঙালী ছাড়া আর কার মাথায় আছে?

বাঙালীকে বাদ দিয়ে যদি চালাতে পারতো, তাহ'লে কি মাড়োয়ারীরা দেশোয়ালী ভাইয়াকে না ডেকে পোদ্দারীর পদে বাঙালীকে ডাকতো? কস্মিন কালেও না।

ওদের দেশোয়ালী ভাইয়ারা কি তবে এসব কার্যের একেবারেই অযোগ্য? তা এই নিয়ে হালেও একটা কাণ্ড হ'য়ে গেছে।

একখানা ব্যাঙ্কনোট ভাঙাতে হবে। বাঙালী পোদ্দার যতোই ভালোমানুষ হোক, বিশ্বাস নেই। অতএব একজন বিশ্বাসী দেশোয়ালী ভাইয়াকে ব্যাঙ্কনোটখানা দিয়ে বললেন—বেঙ্কুলমে যাও, নোটকা রূপেয়া লেআও।

শুঁয়োতোলা উষ্ণীষবাঁধা দেশোয়ালী ভাই ব্যাঙ্কনোটখানা নিয়ে নামলো রাস্তায়। কিন্তু তখন খেয়াল হ'লো, গন্তব্য স্থানের নিশানাটা জানা নেই। এখন কী হবে?

ডরো মৎ, ঘবড়াও মৎ। দেশোয়ালী ভাই পথচারীদের উদ্দেশ্যে প্রশ্নবাণ ছুঁড়তে লাগলো—ব্যাঙ্কুলমে কোন রাস্তাসে যাঙ্গে?

কিন্তু কে দাঁড়িয়ে কার কথার জবাব দেয়। ব'লে যে যার ধান্দায় দিগ্বিদিকে পা চালাচ্ছে জোর কদমে। শেষপর্যন্ত ব্যাটার বরাতজোরে এক ব্যক্তি মন দিয়ে শুনলেন ওর প্রশ্ন। তারপর ভেবেচিন্তে বাৎলে

দিলেন কোন রাস্তাসে ব্যাঙ্কুলমে যাঙ্গে। সেখানে যেতে হয় জলপথে, জাহাজে।

সঙ্গে-সঙ্গে দেশোয়ালী ভাই ফিরে এলো গদিতে ; গোমস্তাকে বললো —হামকো জাহাজমে ভেজতেহো।

বার্তা শুনে তো গোমস্তার জোড়ানয়ন ঠেলে প্রায় কপালে ওঠে। হয়েছে বাপু, ঢের হয়েছে। তখন অগতির গতি গদির বাঙালী পোদ্দারকেই পাঠাতে হ'লো। বলা বাহুল্য, তিনিই ভাঙিয়ে নিয়ে এলেন ব্যাঙ্কনোটখানা। এই বাঙালী ভদ্রলোকের নাম রসিকারমণ পোদ্দার।

বাঙালী পোদ্দারকে বিশ্বাস করতে চায় না মাড়োয়ারীরা, এ-প্রসঙ্গে শুধু দুটো সামান্য বাক্য বলার আছে। আজ পর্যন্ত কোনো বাঙালী পোদ্দার কারো কুঠি থেকে টাকা নিয়ে পালিয়েছে, এমন কথা কেউ বলতে পারবে না। অথচ বহু মাড়োয়ারী বাঙালী পোদ্দারের বেতন বাকি রেখে তল্পিতল্পা সমেত নিজের দেশে ফিরে গেছে, এমন ঘটনার প্রচুর প্রমাণ আছে।

তের

হিন্দু কলেজে লেখাপড়া শেখাতে পাঠিয়ে এখন অনেক অভিভাবক নয়নে সর্ষপপুষ্প দেখছেন। আশা ছিলো, হিন্দু কলেজ থেকে পরীক্ষায় পাশ ক'রে ছেলে রাজসরকারে ওজনদার কার্যে বহাল হ'তে পারবে। সে-আশায় ছাই এখন, ছেলের আচার-ব্যবহার শিক্ষা-দীক্ষা দেখে বাপের প্রাণে আর জল নেই।

হিন্দু কলেজে যাচ্ছে, অতএব বাপ ছেলেকে উত্তম পোষাক বানিয়ে দিলেন। ছেলে নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া করে, কলেজে যায়-আসে। কিন্তু ক্রমশ আরেক রকম হ'য়ে যাচ্ছে ছেলে। আগে-আগে এক-আধটু ঘরের কাজ-কর্ম দেখতো, কথাবার্তা শুনতো। এখন ঘরের কাজ-কর্ম দুরের কথা, বাপের ডাকে সাড়া পর্যন্ত দেয় না সবসময়।

অথচ পোষাক-আষাক কায়দাকানুনের ঘটা বেড়ে যাচ্ছে ক্রমশ। দিব্যি চুল কাটে, সাপাতু জুতো পায়ে দেয়, মালা পরে না, স্নান করে না নিয়মিত, খাওয়া-দাওয়ায় বাছ-বিচার নেই, শুচি-অশুচিতে সমান জ্ঞান, পর্যন্ত দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পেচ্ছাব করে। বাপ যদি উপদেশ দেয় তো ছেলে ইংরেজিতে ব'লে ওঠে—ননসেন্স!

আচার-ব্যবহার তো এমন, কিন্তু ছেলে বিদ্বান হচ্ছে কেমন? বাপ কলেজে খোঁজ নিয়ে শুনলেন যে ছেলে অনেক কিছু পড়ে ওখানে। ইংরেজি-অঙ্ক, ইতিহাস-ভূগোল, আরো-আরো কী সব।

তবু ভালো। একবার নমুনা দেখতে হয় বিদ্যার। কতোদুর শিখলো ছেলে।

টানা কলমে চড়চড় ক'রে ইংরেজি লেখে, কিন্তু কদর্য হস্তাক্ষর। অথচ এ-বিষয়ে কিছু বললে ছেলে মুখে-মুখে জবাব দেয়। সুন্দর হস্তাক্ষর হচ্ছে পেন্টিং। ওতে দরকার নেই। পণ্ডিতদের হস্তাক্ষর নাকি কদর্যই হ'য়ে থাকে।

নিমন্ত্রণ-পত্র কিম্বা বাজারের চিঠিখানা লিখতে পারে না। ওগুলো লেখা নাকি ড্রাজারি!

বাঙলা তর্জমা যা করে তার অর্থ বোঝা শিবের অসাধ্য। পাঁচটা অঙ্ক পর্যন্ত ঠিক দিতে পারে না। পারে শুধু ইংরেজিতে একটা জবাব দিতে—ননসেন্স!

আর জানে সাহেবদের দেশের কিছু-কিছু নদী-পর্বতের নাম-ঠিকানা। অথচ বর্ধমান কলকাতার কোনদিকে জিজ্ঞেস করলে বোবা হ'য়ে থাকে।

আত্মীয়-স্বজনের থেকে দূরে থাকে, পর্যন্ত বাপের কাছে স্থির হ'য়ে থাকে না দু'দণ্ড। থাকবে কি, এরা যে কেউ ইংরেজি জানে না। যথার্থ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে বলে—চোর-ডাকাত, গোরু। বাপ-খুড়োকে বলে—নির্বোধ।

অনবরত মুখে ডাহা মিথ্যেকথা লেগে আছে। বাপ দিশী পোষাক কিনে দিয়েছে, কিন্তু ছেলে তা পরতে চায় না। বলে—আমি জগঝম্পওয়ালা বা কীর্তনের পাইল নই যে এসব পোষাক পরবো। আমি মোজা চাই, ওয়াকিংসুজ চাই, ইজার চাই।

ছেলেকে নিয়ে বাপ গিয়েছেন ৺জগদম্বা দর্শনে। বাপ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন জগদীশ্বরীকে, কিন্তু বেল্লিক ছেলেটা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ৺জগদম্বার উদ্দেশ্যে ইংরেজি ছাড়লো—গুড্ মর্ণিং ম্যাডম্।

কলকাতার এসব ছেলেদের সম্পর্কে তেড়ে একখানা পঞ্চপদী লিখেছেন হুগলির প্রতাপপুরের জনৈক ব্যক্তি, 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রিকায়। সেটা পুরোপুরি উদ্ধৃত ক'রে রাখি:

গিয়াছিনু কলিকাতা, যা দেখিনু গিয়া তথা, কি লিখিব তার কথা,
হা বিধাতা, এই হলো শেষে। ভদ্রলোকের ছেলে যত,
কদাচারে সদা রত, সুরাপান অবিরত, কত মত কুচ্ছ দেশে।
কাঙ্গালি বাঙ্গালি ছেলে, ভুলেও না বাঙ্গালা বলে, ম্লেচ্ছ কহে
অনর্গলে, তেরিয়াঁ হয়ে পথে চলে, কাছ দিয়া গেলে, বলে
গো টো হেল। পেনটুলুন জাকিট পরে, ধুতি চাদর তুচ্ছ করে,
সদাই চাবুককরে মুখে বোলে ইয়েস বেরিওয়েল। এবে

করি নিবেদন, গিয়াছিনু যেইক্ষণ, করিলাম নিরীক্ষণ, কোন
ধামে নব্যভব্য বাবু কতজন ॥ ইংরাজ ফিরিঙ্গি সনে, বসি
সবে একাসনে, টিপিন করে হৃষ্টমনে, জনে২ কথোপকথন ॥
একজন বলে হিয়ের, ডোন লেফ ও মাই ডিয়ের, হুইচ আই সে
হিয়েরং ফিয়ের গাড২ । বেড সোয়ের নো ওয়েল, দেট ইজ
রোড টৌ গো হেল, আল ওবে বাইবেল, দেন উইল গো
নিয়ের লাড২ পরে বলে একদুষ্ট, অশিষ্ট ও অবিস্মৃষ্ট,
লেটকরকালী কৃষ্ণ, না ভজিও দুষ্ট ইষ্ট, তুষ্ট হবেন প্রভু য়িশুখ্রীষ্ট ।
আমি যাহা কহি নিষ্ঠ, ভজ খ্রীষ্ট হবে বেষ্ট, শেষেতে জানিবা
স্পষ্ট, যদি হন খ্রীষ্ট রুষ্ট, যত হিন্দু ব্যাড কেষ্ট, পাইয়া
যথেষ্ট কষ্ট, হবে নষ্ট সহিত শ্রীকৃষ্ণ । পুনঃ কহে এক ষণ্ড,
কেবল পাষণ্ড ভণ্ড, হিয়ের মাই কাইণ্ড ফ্রেণ্ড, ইংলণ্ডে যাইব চলে
সবে । ব্রহ্মাণ্ডের গ্রামখণ্ড, সেই হয় উক্ত খণ্ড, ইহাভিন্ন নেদরলেণ্ড,
আইলণ্ড ও এর্লণ্ড, হোলেণ্ড পোলেণ্ড গিয়া ষণ্ড বুদ্ধি খণ্ডাইব তবে ॥
প্রথমে লণ্ডনে যাব, রিফারমর কহাইব, টেবিলেতে খানা খাব , সিটী
টৌন
আদি বেড়াইব । মনার্ক নিকটে রব, আদর টক্কে কথা কব,
বাঙ্গালার নাম
পাব, বিধবার বিয়া দেওয়াইব ॥ এইরূপ কহে কথা, হেনকালে
আইল তথা,
সঙ্গে দরবান ছাতা, পদদ্বয়ে বুটযুতা, ভদ্রলোকের পুত্র একজন ।
একখানি
গ্রন্থকরে, অতিপুলকিতান্তরে, উপনীত সেই ঘরে, দেখি সবে সমাদরে,
আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া তখন ॥ গুডমারনিং শব্দান্তরেঃ সকলে সেকেহেন
করে, সমাদর পুরঃসরে, যত্ন করে বসিবারে, চৌকি আনি দিল ।
বাবুগণ যত্ন দেখি, বসিলেন হয়ে সুখি, কিছুমাত্র নহেন দুঃখি, সকলের
মুখামুখি, পরে নানা প্রসঙ্গ হইল । কতবা লিখিব তার, উক্ত ব্যক্তি
সভাকার, পরে শুন চমৎকার : যে ব্যাপার কৈল সকলেতে । আর
বা লিখিব কত, মদ্য মাংস আদি যত, আহরিয়া কতমত, সবে হয়ে

সুখান্বিত, নানামত লাগিল খাইতে ॥ ইংরাজ ফিরিঙ্গীসনে, বসি সবে
একাসনে টেবিলেতে হৃষ্টমনে, খাইল দেখি জনে২, ইথে মম হয় মনে,
ঘোর কলির আগমনে, কলিকাতা এত দিনে গেলো৩। তল্লক্ষণ
দেখা যায়, সকলে
কুকর্ম্মে ধায়, ধর্ম্ম পানে নাহি চায়, দিব্য বুট দিয়া পায়, ইংরাজ
সহিতে খায়, একথা
কহিব কায়, হায়২ একাকার হলো৩।

হিন্দুর ছেলেরা কি ইংরেজি শিখলেই নাস্তিক হয়? না। প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের বাড়িতে যথারীতি ঘটা ক'রে দুর্গোৎসব হয়েছে। প্রসন্নকুমারের মতো ইংরেজি কজন বাঙালীবাবু জানেন, শুনি?

ভোলানাথ সেন ইংরেজি 'রিফারমর' পত্রিকার সম্পাদক। এমন কি ঐ পত্রিকায় মাঝে-মাঝে প্রতিমাপুজোর বিরুদ্ধে জনসাধারণের পত্রও প্রকাশিত হ'য়ে থাকে। কিন্তু কই তার বাড়িতে তো মহামায়ার পুজো বন্ধ হয়নি। উত্তম ইংরেজি জানেন হরিমোহন ঠাকুর, নীলমণি দত্ত, তারিণীচরণ মিত্র, গঙ্গাধর আচার্য, নীলমণি দে, উমানন্দন ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, হরচন্দ্র লাহিড়ী, রসময় দত্ত, শিবচন্দ্র দাস, রামপ্রসাদ দাস এবং আরো কতো নাম লিখবো। এদের অনেকেই বিশ্বস্তকর্মে উচ্চপদে নিযুক্ত। কেউ গ্রন্থকার, কেউ দেওয়ান, কেউ সেরেস্তাদার, কেউ খাজাঞ্চি। কিন্তু এরা তো কেউ আপনধর্ম পরিত্যাগ করেন নি।

তবে কি ইংরেজি শিখে নাস্তিক হয় উত্তম চাকরি পায় ব'লে? কিন্তু তাও বা কোথায়। খোঁজ নিয়ে দেখেছি, অনেক ইংরেজি-জানা বেল্লিক নাস্তিক পাঠশালার মাষ্টার কিম্বা ষোলোটাকার কেরানি হ'য়ে উদয়াস্ত কলম ঠেলছে। এই বেল্লিকগুলোর চরম দুর্দশা একেবারে। সাহেবদের কাছেও কল্কে পায় না, আবার হিন্দুরাও ওদের নাস্তিক ব'লে অহোরাত্র দুর-দুর করে।

এখন তবু বাপের পয়সায় কোনোগতিকে খাওয়া-পরা চলছে, কিন্তু এই বেল্লিকদের ভবিষ্যতে কী দশা হবে, কে জানে। হয়তো

আধুনিক দিশী খ্রীষ্টানদের দশা হবে। প্রথম যখন খ্রীষ্টান হবার হিড়িক উঠলো, তখন কারো-কারো আশা হ'লো, বুঝি যিশুখ্রীষ্টের ভজনা করলে একটি খাপসুরৎ বিবি, একখানা বাড়ি আর নগদ একলক্ষ টাকা পাওয়া যাবে। খ্রীষ্টান হবার পর দেখে, ও-আশায় ভস্ম। এই আধুনিক খ্রীষ্টানদের এখন কেউ বাগানের মালি, কেউ দারোয়ান, কেউ খিদমদগার।

তাই বলি, ইংরেজি শেখার সঙ্গে নাস্তিকতার কী সম্পর্ক? সব দোষ হিন্দু কলেজের ঘাড়ে চাপানো কেন?

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার আগেও তো কতো হিন্দুর ছেলে জাহান্নামে গিয়েছে। মদ এবং আনুষঙ্গিকে টাবুটুবু হ'য়ে থেকেছে। অবশ্যি, চরিত্রবানেরাও ছিলো। কিন্তু হিন্দুকলেজেরও সব ছাত্রই কি অসৎ? উঁহু। ভালো-মন্দ-মাঝারি তখনো ছিলো, এখনো আছে। সর্বত্র ত্রিবিধা লোকা উত্তমাধমমধ্যমাঃ!

চোদ্দ

কুলীন বামুনদের পোয়াবারো। একেকজন নিদেনপক্ষে চল্লিশ-পঞ্চাশটা বিয়ে ক'রে যাচ্ছে একদমে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কুলীন বামুনের মাথায় বরের টোপরটি বাঁধা।

বরের শ্বশুরদের অবস্থা কাহিল। হয়তো সাধ্যের অধিক টাকা-কড়ি দিয়ে কোনো বুড়ো বরকে রাজি করিয়ে বাবা তার চারটি মেয়েকে সাতপাক ঘুরিয়ে দিচ্ছে, খবর পেয়ে রে-রে ক'রে একপাল ঘটক এসে উঠলো। ঘটি-বাটি বন্ধক রেখে হোক, যা ক'রে হোক, এই ঘটকগুলোকে অবশ্যি ষোড়শোপচারে খাওয়াতে হবে, হাত ভ'রে দক্ষিণা দিতে হবে। নইলে ডাহা সর্বনাশ হ'য়ে যাবে, মুখ দেখানো যাবে না সমাজে।

পান থেকে চুণ খসেছে কি খসেনি, বরের মাথা সঙ্গে-সঙ্গে আগুন। অথচ যেন কিচ্ছু হয়নি, এমনিভাবে খাওয়া-দাওয়া সেরে রাত্তিরে চুপচাপ শুয়ে পড়লো বৌয়ের পাশে। কিন্তু ভোরের আগেই বর বেপাত্তা হ'য়ে গিয়েছে। যাবার সময় ঘুমন্ত বৌয়ের গা থেকে খুলে নিয়ে গেছে সোনা-রূপোর যাবতীয় অলঙ্কার—মায় পরণের শাড়ি খানা।

কিম্বা অন্য পদ্ধতিও আছে। রাগের মাথায় বৌকে বাপের বাড়ি থেকে প্রথমে তো নিজের বাড়িতে নিয়ে এলো। গা থেকে সব গহনা কেড়ে নিয়ে, তারপর সুরু হ'লো বেদম পিটুনি। সেই পিটুনির খবর পেয়ে বৌয়ের বাপের বাড়ি থেকে হয়তো ছুটে আসে কেউ। এসেই জামাইয়ের কাছে গলবস্ত্র—আমাদের কী-কী ত্রুটি হয়েছে বাবাজী?

ত্রুটির কি অন্ত আছে? অন্ত নেই, কিন্তু পথ আছে ত্রুটিমুক্তির। রূপোর চাকতি ঢালতে পারলে পর্বতপ্রমাণ ত্রুটি পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়।

ট্যাঁকে টাকা গুঁজলো জামাই। এদিকে মেয়ের অবস্থা প্রায় হ'য়ে এসেছে। মারের চোটে শুধু প্রাণটুকু এসে ধুকপুক করছে

গলার কাছে। অবিলম্বে চিকিৎসা চাই। অতএব ঐ অবস্থায় বাপের বাড়ি নিয়ে যেতে হ'লো মেয়েকে।

বাপের বাড়ি না নিয়ে গেলে চিকিৎসাই হবে না এই মরণাপন্ন মেয়ের। কখনো শ্বশুরের মেয়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে না কোনো কুলীন জামাই। আজ্ঞে, ওতে কৌলিন্যের হানি হয়।

শ'খানেক বিয়ে করেছে কুলীন জামাই, পত্নীরা আছে যার-যার বাপের বাড়ি। এদিকে জামাই বাবাজী উপপত্নীর ঘরে গিয়ে দিব্যি মজা লুটছেন। কিন্তু উপপত্নীর কাছে মিনিমাগনায় কিছু হবার নয়। সেখানে ফেলো কড়ি, মাখো তেল। অতএব ফেলতে-ফেলতে ট্যাঁকের কড়ি একদিন ফুরিয়ে আসে। তখন?

আছে, শ্বশুরবাড়ি আছে পাঁচিশগণ্ডা। সেখানে গেলেই কুলীন জামাইয়ের কিঞ্চিৎ-কিঞ্চিৎ অর্থ লভ্য। লাভের অর্থ না পেলে ধুলোপায়েই বিদায় হ'য়ে যাবে শ্বশুরের উঠোন থেকে, বৌয়ের মুখ পর্যন্ত দেখবে না। সন্দেহ কি, কুলীন বামুন বিবাহ-ব্যবসার মহাজন। খরচ নেই এক ছটাক, লাভ মণে-মণে।

কোনো-কোনো মেয়ের স্বামী হয়তো তার জ্যেঠামশায়ের বয়সী। কতো মেয়ে বিবাহরাত্রির পর স্বামীর মুখ জীবনে আর দ্বিতীয়বার দেখেনি। হয়তো স্বামী বেঁচে আছে কি না জানে না, কিন্তু সর্বাঙ্গে আমৃত্যু বহন করেছে বিবাহিতা স্ত্রীর পরিচিহ্ন।

হ্যাঁ, সহৃদয় স্বামীও হয়। হয়তো কোনো ভাগ্যবতী স্ত্রী তার কাছে উপহার পেলো সন্তান। একজনকে উপহার দিয়ে তিনি আবার বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায়। বাঃ, স্বামী হিসেবে অন্য স্ত্রীদের প্রতি তার কর্তব্য আছে না? উপহার কি শুধু একজনের জন্যেই? আহা, উনি বড়ো দয়াময় কুলীন, হৃদয়বান স্বামী!

সেই সন্তানদের অবস্থাটা কী? আর কি, লাথি-ঝাঁটা খেতে-খেতে মামাবাড়িতে দিন কাটায়। পুত্র হ'লে তেমন ভাবনা নেই; বড়ো হ'য়ে কৌলিন্যের জোরে সে-ও বাবার মতো হবে, দিগ্বিদিকে বেরিয়ে পড়বে জয়যাত্রায়।

কন্যা হ'লে;

মায়ের মতো হবে। কান্না, কান্না। সকলের চোখ এড়িয়ে চোখের জলের মধ্যে সারাজীবন নিজের ছায়া ছাখো। আর কিছু দেখতে চেয়ো না, বুঝতে চেয়ো না, জানতে চেয়ো না। কান্না, কান্না।

কুলীন বামুনের দাপটে যোত্রহীন শ্রোত্রিয়, কুলভ্রান্ত বংশজ তথা সমস্ত অকুলীন বামুনের অবস্থা কাহিল। বিয়ে করতে গিয়ে কুলীন বামুন টাকা পায়, বিয়ে করতে হ'লে অকুলীন বামুনকে টাকা দিতে হয়।

কতো টাকা? সে-হিসেব এক কথায় হয় না। একটি মেয়ের জন্যে বিস্তর দরদস্তুর হয়। যে অকুলীন বামুন সবচেয়ে বেশি টাকা দেবে, সেই ঘুরতে পাবে কলাতলায়। বাকি সবাই পাবে কাঁচকলা।

টাকার পাল্লায় জিতে বিয়ে করবে, কজন অকুলীন বামুনের এমন সঙ্গতি? অতএব তাদের অনেকের বিয়েই হয় না জীবনে। বাধ্য হ'য়ে চিরকুমার থাকার দুঃখের তুলনা নেই। সেই দুঃখে অনেক বুকের হাড়-পাঁজরা একেবারে জর্জর হবার দশা।

অকুলীন অবিবাহিত বামুনের আর গোণা-গুণতি নেই, কিন্তু ওদের জন্যে পাত্রী আর ক'জন? একজন পাত্রীর যদি সন্ধান পাওয়া গেলো তো সেখানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে অগুণতি পাত্র। যাদের টাকার জোর সামান্য, তাদের অদেষ্টে কি বৌ জুটবে না?

নদীয়ার এক গাঁয়ের রামরাম চক্রবর্তীর মনের অবস্থা ঘোরতর খারাপ। ইচ্ছে আছে, কিন্তু উপায় নেই বিয়ে করার। ট্যাকের অবস্থা এমন নয় যে টাকার জোরে বিয়ে করতে পারেন। আবার, সংসারে বিবাহযোগ্যা এমন একটি মেয়েও নেই যে আর কোথাও বদ্‌লাবদ্‌লি বিয়ের সম্বন্ধ করেন। পরম করুণাময় ভগবান চক্রবর্তীকে সবদিক দিয়ে মেরেছেন।

সাধ আছে যখন, তখন সাধ্যমতো একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে ক্ষতি কী। অতএব চক্রবর্তী শ্যামনগরের একজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিয়ের কথা-বার্তা পাড়লেন। শ্যামনগরের মেয়ে দেখে চক্রবর্তী মশাই

মহাখুশি। এদিকে শ্যামনগরের বরকর্তাও এলেন মেয়ে দেখতে। এখন উপায় ?

উপায় আর কী, নানা রকম ঘোরপ্যাঁচ ক'ষে চক্রবর্তী মশাই বরকর্তাকে পাশের বাড়ির একটি মেয়েকে দেখিয়ে দিলেন।

পাকাপোক্ত ব্যবস্থা।

কথাবার্তাও পাকা, মায় বিয়ের লগ্ন পর্যন্ত ঠিক হ'য়ে গেলো। শুভলগ্নে চক্রবর্তী মশাই গেলেন শ্যামনগর, শুভলগ্নে শুভবিবাহ সারা।

সেই লগ্নে চক্রবর্তী মশায়ের বাড়িতেও ব্যবস্থা হচ্ছে বিয়ের। পাত্রী ? আছে, ঠিক আছে। অপূর্ব রূপবতী কন্যা। হ্যাঁ, বিয়ে করতে হয় তো এমনি মেয়ে। বরযাত্রীরা আহ্লাদে আটখানা। স্বয়ং বর আজে-বাজে চিন্তা-ভাবনা ছেড়ে তদ্‌গত হ'য়ে ভাবছে বাসরঘরের কথা।

সেই বাসরঘরেই কেলেঙ্কারি। অ্যাঁ, এ কী ?

বরের অবস্থা সঙ্গীন। সত্যিকার স্বপ্নভঙ্গ। এটা কোন দিশী ছলনা ? পাষাণী-টাষাণী না, এ একেবারে অন্য বৃত্তান্ত।

বর বললো—তুমি কে ?

আর কে, রামরাম চক্রবর্তীর ভাগ্নে। বছর বারো বয়স। মামার জন্যে মেয়ে সাজতে হয়েছে। শুধু মেয়ে বলি কেন, বৌ। বারো বছরের ছেলে দিব্যি ডাগর-ডোগর বৌ সেজেছে।

পরদিন অতি প্রত্যুষে বর আর বরযাত্রীরা সটান শ্যামনগরে। তারপর যাকে বলে, আড়ং ধোলাই। প্রহারের পরিমাণ গুরুতর। কেবল প্রাণটুকু ছাড়া রামরাম চক্রবর্তীর শরীরে আর কিছু রইলো না।

নিজের প্রাণ নিয়ে চক্রবর্তী মশাই বিষণ্নবদনে অতঃপর নিজের বাড়িতে ফিরে এলেন। একাই এলেন।

বৌ ? শ্যামনগরের বাবুরা দেয়নি।

তার আর কী করা যাবে। এখনো উপায় আছে অবশ্যি আরেকটা তা হ'লে কন্যাবিক্রেতা ঘটকের কাছে যেতে হয়। টাকা দিলে ওদের কাছে বিয়ের মেয়ে কিনতে পাওয়া যায়। যেমন টাকা, তেমন মেয়ে।

কিন্তু এ-উপায়টা আজকাল খুব নিরাপদ নয়। নানা রকম ভেজাল বেরুচ্ছে।

ঘটককে নগদ টাকা দিয়ে কন্যা কিনে বিয়ে ক'রে দিব্যি সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর-কন্না হ'লো, ফ্যাকরা বেরুলো হয়তো বহুদিন বাদে। সোনা ব'লে ঘটক পিতল চালিয়ে গেছে। বৌ বামুনের মেয়েই নয় আদপে, ধোপার মেয়ে। কিম্বা নাপিতের, অথবা মালাকারের। বর্ধমানের একজনকে তো আষ্টে-পৃষ্ঠে ঘায়েল ক'রে গেছে ঘটক। বামুন ব'লে একটি পরমা সুন্দরী মুসলমানের মেয়েকে গছিয়ে গেছে। বিয়ের বছরখানেক বাদে একদিন লাউকে 'কদু' বলার পর জেরায়-জেরায় বেরিয়ে পড়েছে বৌয়ের জাত।

কিন্তু নিজের বিয়ে নিয়ে প্রায় দুঃসাহসিক কাণ্ড করেছে একটি বামুনের মেয়ে।

মেয়েটির বয়স ষোলো বছর, অথচ বিয়ে হয়নি। তার বাবার প্রায় ধনুর্ভঙ্গ প্রতিজ্ঞা, শুধু উপযুক্ত পাত্র হ'লেই চলবে না, মেয়ের বিয়েতে পণ চাই চারশো টাকা, এ-ছাড়া আনুষঙ্গিক খরচ।

এই টাকাকড়ি ব্যয় ক'রে বিয়ে করবে, ক'জন পাত্রের এমন সঙ্গতি? বয়সের মনে মেয়ের বয়স বাড়ে, বাবাও নিজের মনে পণের অঙ্ক নিয়ে নাড়াচাড়া করেন।

তিন-চার ক্রোশ দূরের এক গ্রামের জনৈক ব্রাহ্মণ সম্প্রতি বিপত্নীক হয়েছে। সেই ব্যক্তি একদিন ভোরে একজন ঘটকের সঙ্গে চ'লে এলো এই বাড়িতে। মেয়ে পছন্দ হ'লে চারশো টাকা পণ আর আনুষঙ্গিক খরচে সে রাজি।

মেয়ের বাবা বললেন—আমি পাত্র দেখবো।

—আমিই পাত্র।

আগাপাশতলা পাত্রকে নিরীক্ষণ ক'রে দেখে বাবা তুষ্ট। তখন পাত্র বললো—আমিও পাত্রী দেখবো।

অতএব পাত্রী এলো। তাকে দেখে পাত্রও তুষ্ট।

মেয়ের বাবা ঘটক আর পাত্রকে বললেন—তাহ'লে তোমরা আজ এখানে থাকো। রাত্তিরে আত্মীয়-কুটুম ডেকে তারপর সব ব্যবস্থা করবো।

বিস্তর কাজ এখন। মেয়ের বাবা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লেন।

এদিকে সময়মতো পাত্রের ডাক পড়লো স্নানের জন্যে, খিড়কির পুকুরে। আর, আশ্চর্য কাণ্ড, সেখানে চ'লে এসেছে স্বয়ং কন্যা। আস্তে-আস্তে সে পাত্রকে বললো—তুমি ওঘাটে চলো। কথা আছে।

কথা তো নয়, যেন অমৃতবর্ষণ হ'লো পাত্রের কানে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সে চ'লে গেলো ও-ঘাটে। আবার অমৃতবাণী শুনলো—আমি কন্যা হ'য়ে নির্লজ্জের মতো তোমার সঙ্গে এ-ভাবে কথা বলছি, এ-জন্যে কিছু মনে ক'রো না। কিন্তু উপায় কী, আমার বাবার ধর্মজ্ঞান নেই, আছে কেবল টাকার লোভ। তাই আমি একটা কাজ করবো ভাবছি। তুমি যদি রাজি হও তো আজ রাত্তিরেই আমার মাসিবাড়িতে চুপে-চুপে আমাদের বিয়ে হ'তে পারে। তা হ'লে যেন-তেন একটা ছুতো ক'রে উপোস থেকো; আমি মাসিবাড়ি গিয়ে জোগাড়-যন্তর করি। আরেকটা কথা, গোটা পঁচিশ টাকা খরচ করতে পারবে তো?

আলবৎ পারবো। সঙ্গে-সঙ্গে পাত্র এসে ঘটককে পাঠালো নিজের বাড়িতে টাকা আনতে। উর্ধ্বশ্বাসে ঘটক গিয়ে পঞ্চাশটা টাকা নিয়ে এলো, টাকা এনে দিয়ে ঘটনার এক-আধটু আভাস-ইঙ্গিত শুনে অবিলম্বে ঘটকের প্রস্থান।

ভেতর থেকে খাবার ডাক এলো, কিন্তু খাবে কি, পাত্র টান-টান হ'য়ে শুয়ে আছে বাইরের ঘরে; হুঁ, অসুখ করেছে। একটু পরে কন্যার কাছ থেকে এলো একজন স্ত্রীলোক, তার হাতে পঁচিশটা টাকা পাঠিয়ে দিলো পাত্র।

মোটের মাথায় সব ব্যবস্থা পাকা। মেয়ের মাসি পর্যন্ত মহাখুশি। টাকাঅন্তপ্রাণ এই ভগ্নাপতির ওপর মেয়ের মাসিও মর্মে-মর্মে চটা।

গোপনে ঐ রাত্রেই শুভবিবাহ হ'য়ে গেলো।

পরদিন ভোরে কন্যা স্বামীকে বললো—আমাদের বাড়ি গিয়ে আমার বাবাকে প্রণাম ক'রে এসো। যদি তিনি রাগারাগি করেন, তুমি কিন্তু কিছু ব'লো না। যা বলবার আমি গিয়ে বলবো।

মেয়ের বাবা বাড়িতে ব'সে মৌজ ক'রে তামাক টানছেন, প্রণাম পাবার পরমুহূর্তেই বললেন—তুমি কে?

—আজ্ঞে, আমি আপনার জামাই। কাল রাত্তিরে আপনার কন্যার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'য়ে গেছে।

কথা শুনে ব্রাহ্মণ তো জ্ব'লে উঠলেন। —ব্যাটা চোর, তুই কার কন্যা কার হুকুমে বিয়ে করেছিস? এখানে কে আছো হে, এই জোচ্চোর ব্যাটাকে বাঁধো, এখনি একে থানায় দিতে হবে। হারামজাদা ব্যাটা লোকের জাত মজাতে এসেছে।

ততক্ষণে কন্যা এসে পড়লো। বললো—আমি বিয়ে করেছি, তুমি ওকে গালাগাল করছো কেন?

কেন তা না ব'লে বাবা আবার তেজী ভাষায় কন্যাকে শুদ্ধ গালাগাল করতে সুরু করলেন।

কন্যা বললো—জাতকুল দেখে-শুনে এর সঙ্গে আমার বিয়েতে তো তুমি রাজিই হয়েছিলে। শুধু টাকা পাওনি তার জন্যে অমন ক'রে গালাগাল করছো কেন?

বটে, বটে। বিহিত করবার জন্যে হুমদুম ক'রে বাবা চ'লে গেলেন থানায়। কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে থানাদার নাক গলাবে কোথায়? অগত্যা হাঁটাহাঁটি করলেন এপাড়া-ওপাড়ার ভদ্রলোকদের বাড়ি। কিন্তু কেউ তার দিকে ঝোল টেনে কিছু বলতে চায় না। জামাইয়ের জাত-কুলে গলদ নেই, অতএব সকলের মুখেই এক কথা—এ তো প্রজাপতির নির্বন্ধ।

কন্যা যদিও এখানে আছে এখনো, জামাই চ'লে গেছে নিজের বাড়ি। পনেরো দিনের মধ্যে জামাইকে আদর ক'রে না আনলে, ষোলো দিনের ভোরে সে নির্ঘাত ডুলি পাঠিয়ে কন্যাকে চোখের সামনে দিয়ে ড্যাং-ড্যাং ক'রে নিয়ে যাবে। আটকানো যাবে না।

কিন্তু চারশো টাকা না হোক, কিছুই কি পাওয়া যাবে না? ঝগড়া-ঝাটি করলে চার পয়সাও জুটবে না কপালে। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে-চিন্তে শ্বশুর মশাই চোদ্দদিনের ভোরে জামাই আনতে ছুটলেন। ভালোয়-ভালোয় যদি তবু কিছু মেলে!

মিললো। একশো টাকা। পরম আপ্যায়িত হ'য়ে জামাইবাবাজী শ্বশুরমশায়ের শ্রীচরণে রেখেছে টাকার বাণ্ডিলটা।

লুকিয়ে-লুকিয়ে বিয়ের আরেকখানা সরস সমাচার আছে। বুড়োর বিয়ে।

সারা মাথায় দিব্যি ধবধবে সাদা চুল, নির্দন্ত মাড়ি, কারণে- অকারণে শরীর কাঁপে ; দুনিয়ার দিন শেষ হ'য়ে এসেছে প্রায়, কিন্তু তবুও বুড়ো রসিক সুজন, রসের নাগর। শূন্য ঘরে মন হা-হা করে। অতএব ?

যা ভাবা যায় না, তাই। বিষয়টা পাড়া-পড়শীর কানে গেলে হয়তো হেজে যাবে, অতএব উনি চুপে-চুপে ঘটক পাকড়ালেন। চুপে-চুপে ঘটক পাকা ক'রে ফেললো বিয়ের ব্যবস্থা।

পাত্রের বয়সের গাছ-পাথর নেই। কিন্তু পাত্রীর বয়সও খুব কম নয় ; পুরোপুরি সাত বছর চলছে। থাকে কলুটোলায়।

পাড়া-পড়শীর চোখ-কান এড়িয়ে বুড়ো তো যথালগ্নে লুকিয়ে-লুকিয়ে দিব্যি সাজ-পোষাক ক'রে যাত্রা করলো।

কিন্তু বাতাসেরও চোখ আছে, দেয়ালেরও কান আছে। অ্যাঁ, শ্মশানের চিতায় না শুয়ে এই বুড়ো কি না এখন শুতে যাচ্ছে বাসরঘরের খাটে। কোথায় গঙ্গাযাত্রা করবে, তা নয় অন্তিমকালে বুড়োটা বরযাত্রা করলো !

পাড়া-পড়শী বাবুরা মুহূর্তে সাব্যস্ত ক'রে ফেললেন, নেমন্তন্ন করুক আর না করুক, বুড়োর বিয়ের বরযাত্রী যেতে হবে। অভিনব বরযাত্রী।

সঙ্গে-সঙ্গে এরা জোগাড় ক'রে আনলেন কয়েকটি অস্থিচর্মসার বেটুয়া ঘোড়া, ঘোড়ার পিঠে উড়িয়ে দেওয়া হ'লো নানা রকম নিশান। পথিমধ্যে বরকে পাকড়াও করা হ'লো। তারপর ব্যবস্থামাফিক কয়েক-জন চিকিৎসক মুহুর্মুহু বরের নাড়ি পরীক্ষা ক'রে দেখতে আরম্ভ করলেন। সঙ্গে কেউ বাজাচ্ছে খোল-করতাল, কেউ-ফুঁকছে শিঙ্গা। আর সমান বিক্রমে সঙ্গীতও চলছে, গঙ্গাযাত্রার সঙ্গীত—গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম !!

তা ব'লে বিয়ে আটকায় নি। শুভবিবাহ বলতে গেলে নির্বিঘ্নেই সমাধা হ'লো। হাঁ-হাঁ, শুভ বিবাহ বৈকি !

প্রায় সব বিবাহেই রঙ্গ-রসের অঢেল কারবার চলে। কিন্তু চূড়ান্ত রঙ্গ হয়েছে বোধ করি আতড়িখড়শীর মিত্তিরবাড়িতে। মিত্তিরবাড়িরই একটি মেয়ের বিয়ে। পাত্র—হরিপুরের রামমোহন বসুর ছেলে।

যথাসময়ে বরযাত্রীরা তো সদলবলে এসে পৌঁছুলেন। ভালো লগ্নে ভালোয়-ভালোয় বিয়ে হ'য়ে গেলো। খাওয়া-দাওয়া সেরে বরযাত্রীরা গেলেন ঘুমুতে।

কিন্তু ঘুম ভেঙে মাঝরাত্তিরে কেলেঙ্কারি কাণ্ড। অন্ধকার ঘরের মধ্যে ফোঁসফোঁস শব্দ, হিলিবিলি ক'রে ঘরময় কী যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। কী?

আর কি, সাংঘাতিক জিনিস। পিতৃদত্ত প্রাণ বাঁচাতে হ'লে এই মুহূর্তে দরজা খুলে পালাতে হয়। হুড়মুড় ক'রে বাবুরা দরজায় ধাক্কা লাগালেন। কিন্তু কী সর্বনাশ, দরজা যে বাইরে থেকে বন্ধ।

দরজা বন্ধ। অন্ধকার ঘর। ফোঁস-ফোঁস শব্দ ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অতএব নিরুপায় বরযাত্রীরা সমস্বরে গলা ফাটিয়ে চীৎকার শুরু ক'রে দিলে। বাপরে, মলেম রে, ওরে সাপে খেলে রে, তোমরা এগোও রে।

ডাকাত পড়েছে ভেবে গাঁয়ের চৌকিদার হৈ-হৈ ক'রে ছুটে এলো। কিন্তু বন্ধ দরজার বাইরে জট পাকাচ্ছে কন্যাযাত্রীরা। ডাকাত-ফাকাত কিছু না, কন্যাযাত্রীরা একটু রসিকতা করছে বরযাত্রীদের সঙ্গে।

রসিকতা? তাই বলো। তবে তো সাপও নেই নিশ্চয়ই।

বাঃ, ডাকাত নেই ব'লে সাপও থাকবে না? বললাম যে রসিকতা হচ্ছে। হেলে, ঢোঁড়া ও ঢেম্না, এই তিন রকম সাপ বরযাত্রীদের ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছে কন্যাযাত্রীরা।

দরজা খুলতে হুদ্দাড় ক'রে বেরিয়ে এলেন বরযাত্রীরা। ভয়ে আম্‌সি হ'য়ে গেছেন একেকজন। পরমরসিক কন্যাযাত্রীরা তখনো দাঁত বের ক'রে হাসছেন।

তারপর আস্তে-আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো সাপগুলো। তিন রকম সাপ—হেলে, ঢোঁড়া ও ঢেম্না।

সত্যি-সত্যি সাপ। সত্যি সাপ ছাড়া কি সত্যি রসিকতা হয়?

পনের

স্কটল্যাণ্ডের সাহেব এসে ঘড়ির দোকান খুলেছেন কলকাতায়। কিন্তু ঘড়ির ব্যবসা করবেন কি, সাহেবের মন প'ড়ে আছে এই দেশের দুর্গত মানুষের দিকে। তেমন ক'রে ঘড়ির টিকটিক শুনতে পান না, উনি শোনেন মানুষের হৃদপিণ্ডের টুকটুক। বড়ো দুর্বল হৃদ্‌পিণ্ড। বড়ো দুর্বল!

স্কটল্যাণ্ডের শাদা সাহেব কালো বাঙালীর দেশকে ভালোবেসে ফেললেন। আর ভালোবাসার টান বড়ো সাংঘাতিক টান। তাতে সব হিসেব রাখা যায় না। তাতে ঘড়ির ব্যবসা টেঁকে না।

হেয়ার সাহেব ঘড়ির কারবার বেচে দিলেন। তারপর উদয়াস্ত পরিশ্রম।

সকালবেলা পাল্কিতে বেরিয়ে পড়েন হেয়ার। ঘুরে-ঘুরে ইস্কুলে-ইস্কুলে প্রত্যেক ছেলের তত্ত্ব-তালাশ করেন। একবার এখানে, এক বার ওখানে। এই আড়পুলি, এই কালীতলা।

অমুকে আজ ইস্কুলে আসেনি। আসেনি? আহা, অসুখ করেছে বুঝি। হেয়ার সাহেব ঠিক তার বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছেন। ওষুধ-পথ্যের কী ব্যবস্থা হয়েছে, শুনি? এখনো কিছু হয়নি? আর দেখতে হবে না। সব ব্যবস্থা না ক'রে হেয়ার সাহেব আর এক পা-ও নড়ছেন না।

ছুটির ঘণ্টা বেজেছে ইস্কুলে। নিচু কেলাশের ছেলেরা হুড়মুড় ক'রে বেরিয়ে পড়লো। আরে, হেয়ার সাহেব এসেছেন যে!

ছেলেরা সাহেবকে ঘিরে দাঁড়ালো। সাহেব দু'হাত উঁচুতে তুলে উদ্বাহু হ'য়ে আছেন। হাতে ওটা কী? খেলার বল।

তখন আর কথা নেই। কেউ সাহেবের কোমর জড়িয়ে ধরছে, কেউ গা বেয়ে উঠছে, কেউ কাঁধে ঝুলছে। সাহেবের মহাস্ফূর্তি!

ছুটির শেষে কিম্বা আরম্ভের আগে একদিন হয়তো দেখা গেলো হেয়ার সাহেব ইস্কুলের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর হাতে গামছা।

—এই! তোমার গায়ে-মুখে এত ময়লা কেন? পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে পারো না?

মুখে তিরস্কার চালাচ্ছেন, ওদিকে গামছা দিয়ে ছেলের গা হাত মুছে দিচ্ছেন হেয়ার।

রাস্তায় পাল্কির মধ্যে চলেছেন, তবু সবাই কেমন ক'রে যেন টের পেয়ে যায়। দু'ধারে পাল্কির সমান তালে ছেলেরা ছুটতে থাকে। ছুটতে-ছুটতেই বলে—মি পুওর বয়, হ্যাভ পিটি অন মি, মি টেক ইন ইয়োর স্কুল।

অর্থাৎ, ফ্রিতে ইস্কুলে ভর্তি ক'রে নাও।

ফ্রিতে ভর্তি হবার জন্যে একদিন রামতনু লাহিড়ী এলো হেয়ারের কাছে। কিন্তু তার আগেই অনেক ফ্রি ছাত্র নেওয়া হ'য়ে গেছে। আর এবার হ'লো না।

সেকথাই হেয়ার বললেন—খালি নেই, এখন নিতে পারবো না।

রামতনু বুঝলো, আশা নেই। কিন্তু গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার রামতনুকে অন্য কথা বললেন। তিনি পরামর্শ দিলেন—হেয়ারের পাল্কির সঙ্গে-সঙ্গে কিছুদিন ছুটতে হবে।

বিনাবাক্যব্যয়ে রামতনু সেই পরামর্শ মেনে নিলো। হাতিবাগান থেকে সকালবেলা বেরিয়ে পড়ে। কোনোদিন খেয়ে, কোনোদিন না খেয়ে। সাহেবের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে লক্ষ্য রাখে, কখন হেয়ার পাল্কি চেপে বেরিয়ে যান।

পাল্কির সঙ্গে-সঙ্গে রামতনুরও ছুটবার পালা সুরু হয়। পাল্কি জোরে দৌড়য় তো রামতনুও জোড়পায়ে দৌড়য়, পাল্কি আস্তে তো রামতনুও আস্তে, পাল্কি থামলো তো রামতনুও নড়লো না। সারাদিন এই কাণ্ড!

সারাদিন ঘোরাঘুরির পর হেয়ার একদিন বিকেলে বাড়ি ফিরে পাল্কি থেকে নামছেন, তখন চোখ পড়লো রামতনুর মুখে। শুকনো, শূন্য মুখ। মুখের চেহারা দেখেই হেয়ার রামতনুর পেটের অবস্থাটা আঁচ করলেন। জিজ্ঞেস করলেন—তোমার কি খিদে পেয়েছে? কিছু খাবে?

না, না। এ বড়ো ভয়ের কথা, অসম্ভব কথা। সাহেব বিদেশী, সাহেব বিধর্মী। তাঁর বাড়িতে আহার করলে সমাজ যদি রামতনুকে জাতিচ্যুত করে!

ভয়ে-ভয়ে রামতনু বললো—না, আমার খিদে পায়নি।

মুখের কথার দিকে কান না দিয়ে হেয়ার রামতনুর মুখের দিকে তাকালেন। মুখের দিকে তাকিয়েই এক লহমায় ওর মনের কথা টের পেলেন। বললেন—সত্যি কথা বলো, আমার বাড়িতে তোমাকে খেতে হবে না। বলো, আজ সারাদিন কিছু খেয়েছো? ভয় নেই, বলো। আমার বাড়িতে তোমাকে খেতে হবে না। ঐ মিঠাইওয়ালা তোমাকে খাওয়াবে।

সামনের মিঠাইর দোকান দেখিয়ে দিলেন হেয়ার। এই দোকানের সঙ্গে সাহেবের ব্যবস্থা আছে। বিস্তর ছেলে সাহেবের বাড়িতে আসে, এই দোকানে তাদের মিষ্টিমুখ ক'রে যেতে হয়। আহা, ছেলেরা একটু মিষ্টি-টিষ্টি খাবে না?

হেয়ার বললেন—বলো, আজ সারাদিন কিছু খেয়েছো? তখন রামতনু হু-হু ক'রে কেঁদে ফেললো—আজ আমার খাওয়া হয়নি।

এই একরত্তি ছেলে সারাদিন না খেয়ে আছে? হেয়ার মিঠাই-ওয়ালাকে ব'লে দিলেন—একে পেট ভ'রে মিঠাই খেতে দাও।

অনেকদিন এই দোকানে পেট ভ'রে মিঠাই খেয়েছে রামতনু। আর, আসলকথা যা, তাও হ'লো শেষ পর্যন্ত। হেয়ার রামতনুকে ফ্রিতে ভর্তি ক'রে দিলেন।

এই রামতনু যখন হিন্দু কলেজে পড়ে, তখন তার ওলাওঠা হ'লো একবার। খবর পাওয়া মাত্র হেয়ার এসে চিকিৎসা সুরু ক'রে দিলেন।

সেদিন সারাদিনেও রোগীর কোনো খবর পাননি। সন্ধ্যার পর, লালদীঘির কাছ থেকে হেঁটে, দুর্গন্ধে-আবিল জঘন্য গলির মধ্যে রামতনুর বাড়ি এসে হাজির। কিন্তু সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে, বাড়ির দরজা বন্ধ।

সাহেব দরজা ধাক্কাতে লাগলেন।

হয়তো কে-না-কে এক মাতাল গোরা বেহেড হ'য়ে এসে দরজা ধাক্কাচ্ছে। থাক দরজা বন্ধ।

দেরি দেখে হেয়ার ইংরেজি ছেড়ে হিন্দী ধরলেন—ডরো মৎ, হাম হেয়ার সাহেব হ্যায়।

সঙ্গে-সঙ্গে দরজা খুলে গেলো। হেয়ার! ও আমাদের পরমাত্মীয়ের নাম। ও-নামের কাছে আমাদের সমস্ত দরজা অবারিত।

একজন বন্ধুর সঙ্গে ভূদেব মুখুয্যে বৈশাখের এক দুপুরে হেয়ার সাহেবের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। দুপুরে এসেছে, বিকেল চারটের মধ্যে বাড়ি ফিরে যাবে, যেতেই হবে। ভূদেবের বাবার আদেশ। শুধু ভূদেব কেন, কলকাতায় সব ভদ্রলোকের ছেলেরই বিকেল চারটের পর বাড়ির বাইরে থাকা বারণ। কলকাতায় ভয়ঙ্কর ছেলে-ধরার উৎপাত, প্রায়ই ছেলে চুরির খবর শোনা যায়। সেজন্যে সবাই সতর্ক। সবাই ভয়ে-ভয়ে থাকে।

কিন্তু ভূদেব কি ভীরু না সাহসী? হেয়ার সাহেব ঠিক করলেন, আজ একবার ভূদেবের সাহসের পরীক্ষা নেবেন। তাই হেয়ার সাহেব সন্ধ্যে অবধি ওদের দু'জনকেই আটকে রাখলেন। সন্ধ্যের সময় বললেন—এখন তোমরা বাড়ি যেতে পারো।

বৈশাখ মাস। কালবৈশাখীর কাল। যখন তখন ঝড়বৃষ্টি আসতে পারে।

এলোও তাই। ওরা দু'জন লালবাজারে আসতে-আসতে ঝড়-বৃষ্টিও এসে গেলো।

ভূদেবের আবার ভূতের ভয় আছে। কিন্তু ভূদেব ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ছেলে, বাবার মুখে শুনেছে রাম-নামের মহিমা; রাম-নাম করলে ভূতের এমন সাধ্য নেই যে কাছে আসে। ভূদেব আর তার সঙ্গের সেই বন্ধু—দু'জনেই রাম-নাম করতে-করতে হাঁটতে লাগলো। হাঁটতে-হাঁটতে এলো হেদোর কাছে।

অতি সাংঘাতিক এই এলাকা। সন্ধ্যের সময় কোনো ভদ্রলোক সাহস ক'রে এখানে আসেন না। সমস্ত কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে মাত্র দুটি রেড়ির তেলের আলো জ্বলে—একটি অক্রুর দত্তের বাড়ির সামনের

গলির মোড়ে এবং আরেকটি হেদোর পুকুরের উত্তর-পশ্চিম কোণে। হেদোর পুকুরের চারদিকে নিবিড় কেয়াবন।

ভূদেব দেখলো—সেই কেয়াবনের থেকে লাঠি হাতে ক'রে বেরিয়ে এসেছে দুই ভীষণ মূর্তি—শক্ত-সমর্থ, দীর্ঘকায়।

ভূত-প্রেত নাকি? ভূদেব আর তার বন্ধু অবিরাম 'রাম-নাম' ক'রে যেতে লাগলো।

ঠিক তক্ষুনি পেছন থেকে শোনা গেলো ভূদেবের নাম—ভুডেব, ভুডেব।

ঝড়বৃষ্টি তখনো চলছে। পেছন ফিরে ভূদেব দেখলো, ছোটো একখানি টমটম গাড়ি হাঁকিয়ে স্বয়ং হেয়ার সাহেব এসে উপস্থিত হয়েছেন। সাহেবকে দেখেই সেই দুই ভীষণ মূর্তি কেয়াবনের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

ভূদেব আর তার বন্ধুকে হেয়ার সাহেব গাড়িতে উঠতে বললেন।

গাড়িতে উঠবে কি, সাহেবের ওপর ভূদেব তখন মহাবিরক্ত। ভূদেব তখন দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য। হেয়ার সাহেবকে ভূদেব বিনা দ্বিধায় ব'লে ফেললো—শালা!

বন্ধুকে নিয়ে বাড়ির দিকে পা চালালো ভূদেব। পেছন-পেছন হেয়ার সাহেবও গাড়িতে আসতে লাগলেন।

তিনজনেই একসঙ্গে পৌঁছলো ভূদেবের বাড়িতে। সন্ধ্যে পার হ'য়ে গেছে, ভূদেবের মা-বাবার এতক্ষণ বড়ো দুর্ভাবনায় কেটেছে। খুব খারাপ দিন-কাল। সেদিন বিকেলেই ও-পাড়া থেকে একটি বাগ্দীর ছেলেকে ছেলে-ধরায় ধ'রে নিয়ে গেছে। দুর্ভাবনার যথেষ্ট কারণ আছে বৈকি!

তা ভূদেবের বাড়ির দুর্ভাবনা তো মিটলো। তারপর হেয়ার সাহেব ভূদেবের বাবাকে বললেন—আপনার ছেলে আমাকে 'শালা' বলেছে।

'শালা' বলেছে? শুনেই ভূদেবের বাবা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে ভূদেবকে বললেন—সাহেব তোর গুরু। গুরুকে এই দুর্বাক্য বলেছিস। এখনি এঁর পায়ে ধ'রে ক্ষমা ভিক্ষা কর।

কিন্তু ভূদেব হেয়ার সাহেবের পা ছুঁলো না। ভূদেবের বাবা একজন আচারনিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। ভূদেবের ডানহাতখানি নিয়ে বাবা রাখলেন হেয়ার সাহেবের পায়ে।

ভাবি, শ্রদ্ধা কতোখানি গভীর হ'লে ভূদেবের বাবার মতো একজন ব্রাহ্মণ লোকাচারের সমস্ত বাধা-নিষেধকে তুচ্ছ ক'রে ছেলের হাত নিয়ে একজন সাহেবের পাদস্পর্শ করাতে পারেন।

চন্দ্রশেখর দেব, হিন্দু কলেজের আরেকটি ছাত্র, একদিন সন্ধ্যের সময় গ্রে সাহেবের বাড়িতে হেয়ারের সঙ্গে দেখা করতে গেছে। কথা বলতে-বলতে রাত হ'য়ে গেলো। ওদিকে বৃষ্টি নামলো মুষলধারায়।

এই বৃষ্টির মধ্যে যাবে কোথায়? সেই মিঠাইওয়ালার দোকান থেকে হেয়ার চন্দ্রশেখরকে দেদার মিঠাই খাওয়ালেন।

বৃষ্টি থামলে হেয়ার বললেন—চলো, তোমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি। পথে গোরারা আছে, তোমাকে একলা যেতে দিতে পারি না!

একখানা মোটা লাঠি হাতে নিয়ে হেয়ার চন্দ্রশেখরের সঙ্গে চললেন। বৌবাজারের মোড়ে এসে চন্দ্রশেখর বললেন—আপনাকে আর আসতে হবে না।

হেয়ার বললেন—না, চলো মাধব দত্তের বাজারের কাছে দিয়ে আসি।

শেষকালে যখন কলেজের দীঘির কোণে এসে পড়েছেন, তখন বললেন—আচ্ছা, এবার আমি দাঁড়াচ্ছি। তুমি যাও।

চন্দ্রশেখর চ'লে গেলো। তার বাড়ি পটুয়াটোলা লেনে।

বাড়ির দরজা বন্ধ হলো, খানিক বাদে দরজায় শব্দ উঠলো। কে?

আর কে, হেয়ার সাহেবের গলা—ইজ চন্দর ইন?

এতদূর চন্দ্রের সঙ্গে এসেও হেয়ার তৃপ্ত হ'তে পারেন নি, নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন নি। কী জানি, ছেলেটা ঠিকমতো ঘরে পৌঁছতে পারলো কি না। একবার দেখে গেলাম।

·

এবার যেতে হবে।

মে-মাসের গভীর রাত্রি। দু'একবার দাস্ত-বমি হ'লো। হেয়ার বুঝলেন, কালব্যাধি। এবার আর নিস্তার নেই। এবার যেতে হবে।

চিরকুমার হেয়ার। এই নিষ্ঠুর রাত্রে তাঁর একমাত্র সঙ্গী তাঁর প্রিয় বেয়ারা। তাকে ডেকে বললেন—গ্রে সাহেবকে গিয়ে আমার জন্যে কফিন আনাতে বলো।

পরদিন সকালে ডাক্তার এলেন। প্রসন্নকুমার মিত্র, ইনিও হেয়ারের ছাত্র। মানুষের যতোখানি সাধ্য, প্রসন্নকুমার তার ত্রুটি রাখলেন না। কতো আগ্রহ, কতো চেষ্টা, কতো যত্ন! কিন্তু কিছুতেই কিছু হবার নয়। এই কালান্তক ব্যাধি দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে, তার গতিরোধ বুঝি অসম্ভব, অসম্ভব।

ওলাওঠায় ব্লিষ্টার লাগানো বিধি। হেয়ারের সারাগায়ে সেই ওষুধ। পরদিন বিকেলের দিকে হেয়ার আস্তে-আস্তে ডাক্তারকে বললেন—প্রসন্ন, আর ব্লিষ্টার দিওনা। আমাকে শান্তিতে মরতে দাও।

সকালবেলা সারা শহরে আর্তরোল উঠলো—হেয়ার নেই!

আপন পরিবারের একজন পরমাত্মীয় চ'লে গেলেন, এমনি অকুণ্ঠ বিশ্বাসে বহু হিন্দুনারী সেদিন আকুল হ'য়ে কেঁদেছে। বহু বালক কাঁদতে-কাঁদতে গ্রে সাহেবের বাড়িতে ছুটে এসেছে। হেয়ার নেই!

শেষযাত্রায় তাঁর সঙ্গী হ'লো হাজার-হাজার আবালবৃদ্ধ ভগ্নহৃদয়, হৃতসর্বস্ব। বৌবাজারের চৌরাস্তা থেকে মাধব দত্তের বাজার পর্যন্ত সমগ্র রাজপথ সে-যাত্রায় জনপ্লাবিত। হেয়ার নেই!

গোঁড়া খ্রীষ্টানদের চোখে হেয়ার খ্রীষ্টান নন, হিন্দু। অতএব, খ্রীষ্টানের সমাধিক্ষেত্রে হেয়ারের স্থান হ'লো না। স্থির হ'লো, হিন্দু-কলেজের সংলগ্ন ভূমিখণ্ডে সমাহিত হবে এই দেহাবশেষ। হেয়ার নেই!

সর্বজনের বুকে দীর্ঘশ্বাস, চোখে জলবিন্দু। আর তার সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে নামলো ভুবন-প্লাবন ঝড়-বৃষ্টি। ঝড় আর বৃষ্টি। যেন হাওয়ার লক্ষ হাহাকার আর আকাশের অশ্রান্ত অশ্রুধারা।

হেয়ার নেই!

কিন্তু সব শোকেরই শেষ আছে, সময়ের সঙ্গে সব বেদনাই বিলীন হ'য়ে যায়। তবু এই মুহূর্তে মনে হয়, এই হাহাকার যেন অনন্তকাল থাকবে, এই শোকাশ্রু যেন কোনোদিন শুকাবে না।

বোল

চড়ক পূজো উপলক্ষে এলাহি কাণ্ড হয় এদিকে-ওদিকে।

তখন নানারকম সংবাজি দেখায় সন্ন্যাসীরা। সেই সং দেখতে ভিড় ভেঙে পড়ে রাস্তায়।

চিৎপুরের রাস্তায় অসংখ্য ঢাক বেজে উঠলো বীরবিক্রমে। হু, সং আসছে। সঙ্গে-সঙ্গে রাস্তা লোকে লোকারণ্য, পর্যন্ত রাস্তার হু'দিকের বাড়িগুলোর বারান্দা মাথায়-মাথায় গিজিগিজি।

এলো সং। প্রথমে তো সন্ন্যাসীরা চড়কঘোরা বাণফোঁড়া কসরৎগুলো দেখালো।

তারপরে এলো বাঁশবাঁকারি দিয়ে বানানো একখানা ময়ূরপঙ্খী; মাঝিরা দাঁড় বেয়ে যাচ্ছে গানের তালে-তালে। মধ্যে একটা পাঠশালা। সেখানেই রগড়। বালক নয়, পাঠশালার ছাত্রগুলো সব ধাড়ী-ধাড়ী। সেই ধাড়ীগুলোর মূর্খতার বহর দেখে গুরুমশাই লজ্জা পেয়েছেন, হতাশ হ'য়ে বলছেন—আমি এদের আর মেরে সোজা করতে পারি না।

তারপরে এলেন চন্দনচর্চিত, পুষ্পশোভিত একজন বৃদ্ধ। ইনি একজন দেবতা, এমনি ভাবখানা। দেবতার ভক্ত কই? আছে, দেবতার পায়ের কাছে ব'সে দেবতার পা পুজো করছে ভক্ত। সেই দেবতার পায়ে কিন্তু প্রকাণ্ড গোদ। হচ্ছে দেবতার পা পুজো, কিম্বা বলি, গোদ পুজো।

তারপর বেহারারা ব'য়ে নিয়ে এলো একখানা চিত্র-বিচিত্র ডাণ্ডি-ওয়ালা তক্তা; তার ওপরে ব'সে আছেন একজন তপস্বী। মালা জপতে-জপতে তিনি একবার তাকাচ্ছেন দেবমূর্তির দিকে, আরেকবার রাস্তার হু'পাশের বাড়ির বারান্দার দিকে। বারান্দাগুলোয় বিস্তর মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

চড়কপর্বের বীভৎস উপচার ঐ বাণ-ফোঁড়া আর চড়ক-ঘোরা। শরীরের বিভিন্ন অংশে বাণ ফুঁড়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে চড়ক-ঘোরা। ফলত, দুর্ঘটনা অবশ্যম্ভাবী। অন্ত নেই তেমন দুঃসংবাদের।

শিববেশধারী একজন সন্ন্যাসী দু'পায়ে বাণ ফুঁড়ে ঊর্ধ্বপদে অধঃশিরে নির্নিমেষাক্ষ হ'য়ে ঘুরছেন আর অনবরত হাঁক ছাড়ছেন—দে পাক, দে পাক। উনি আকণ্ঠ মদ গিলে নিয়েছেন। প্রায় আধঘণ্টা বাদে ঐ শিববেশধারী দীর্ঘজটাযুটযুক্ত ফণিফণান্বিত সন্ন্যাসীর সারাশরীর রক্তে মাখামাখি। পায়ের বাণফোঁড়া অংশের মাংস বিচ্ছিন্ন, বিক্ষত।

দক্ষিণ এণ্টালির রাস্তায় আরেকজন সন্ন্যাসী ঘূর্ণায়মান অবস্থায় ছিটকে পড়লো ষাট হাত দূরে। সর্বাঙ্গ চূর্ণ-বিচূর্ণ, মুখখানা পিণ্ডাকার।

এ তো গেলো চড়ক পূজোর বৃত্তান্ত।

শারদীয়া দুর্গা পূজোর সময়েও হুলুস্থুল কাণ্ড। নাচ-গান, খাওয়াদাওয়া, কতো কী। দেশব্যাপী আনন্দোৎসব। সব গৃহস্থেরই কিছু এমন সঙ্গতি নেই যে ঘটা ক'রে বাড়িতে দুর্গোৎসব করে। কিন্তু আনন্দের ভাগ সকলেই পায় অল্প-বিস্তর। না, ভুল হ'লো। সকলেই পায় না। কারো-কারো উৎসবের আনন্দকেও আমরা বিষিয়ে দিতে জানি।

অমুকের বাড়িতে কি দুর্গা পূজো হয়? হয় না। কিন্তু পাড়ায় উদ্যোগী পুরুষের অভাব নেই। তারা জনকয়েক মিলে গভীর রাত্রে গোপনে অমুকের বাড়িতে রেখে এলো একখানা দুর্গা প্রতিমা। উপায় নেই, পূজো করতেই হবে। লোকভয় আছে, ধর্মভয় আছে। ঐ গৃহস্থ হয়তো সম্বৎসরের চেষ্টায় কায়ক্লেশে দুঃসময়ের সম্বল হিসেবে সঞ্চয় রেখেছিলো কয়েকটি টাকা। পূজোর জন্যে সর্বস্ব গেলো তার। কিন্তু লোকভয়ে কিম্বা ধর্মভয়ে সকলেই এমনি জুজু হ'য়ে থাকে না।

একজন গৃহস্থ সকালবেলা উঠে দেখলেন, কারা যেন দুয়ারে দুর্গা প্রতিমা রেখে গেছে। বেশ করেছে। উনি শুধু সরস্বতীর প্রতিমাখানা তুলে রেখে দিলেন। শ্রীপঞ্চমীতে কাজে লাগবে, তখন আর গাঁটের পয়সা খসিয়ে সরস্বতীর মূর্তি কিনতে হবে না। বাদবাকি কার্তিক-গণেশ-লক্ষ্মী-দুর্গা ইত্যাদির এই গৃহস্থের দুয়ারে গড়াগড়ির দশা!

বেলঘরিয়ায় আরেক ভদ্রলোক সকালে উঠে দেখেন, দুয়ারে কারা একখানা দুর্গাপ্রতিমা রেখে গেছে। বটে, বটে। রাগে ভদ্রলোকের আর জ্ঞান-গম্যি রইলো না। ঘর থেকে দা এনে ঐ প্রতিমাখানাকে টুকরো-টুকরো ক'রে উনি নিজের পুকুরে ফেলে দিলেন।

প্রতিমাখানা যারা রেখে গিয়েছিলো, খবর পেয়ে তারা হা-হা ক'রে ছুটে এলো। এ কী সব্বনেশে কাণ্ড! যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে ওদের। এখন ওরা প্রতিমাখানা উঠিয়ে নিয়ে যাবে, পূজো করবে সরকারি জায়গায়।

বটে, বটে। ভদ্রলোকের আর সহ্য হ'লো না। উনি একাই দলসুদ্ধু ওদের মেরে ভাগিয়ে দিলেন। পূজো পাওয়া দূরের কথা, মা দুর্গা টুকরো-টুকরো হ'য়ে রইলেন ভদ্রলোকের পুকুরে।

এ-জন্মে অনেক কিছু শুনলাম, দেখলাম, কিন্তু দুর্গাপূজো নিয়ে চুঁচুড়ায় যে-কাণ্ড শুনলাম তার আর তুলনা দেখলাম না।

চুঁচুড়ার তাঁতি আর শুঁড়িরা মিলে ঠিক করলো, একখানা বারোয়ারি দুর্গা পূজো করতে হবে। চতুর্ভুজা দুর্গার প্রতিমা হ'লো। কিন্তু গণ্ডগোল উঠলো পূজোর সময়।

তাঁতিরা বৈষ্ণব। তারা বলে, দুর্গার সামনে বলিদান চলবে না।

শুঁড়িরা শাক্ত। তারা বলে, বলিদান ছাড়া পূজোই হবে না।

এখন উপায়? চলো, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে নালিশ করি। তিনি যা বিধান দেবেন, তাই হবে। শামিয়ল সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট। মামলা শুনে তিনি হুকুম দিলেন, আগে তাঁতিরা বৈষ্ণবমতে পূজো করবে; পরে, শুঁড়িরা শাক্তমতে বলিদান ক'রে পূজো সারবে।

তাই হ'লো। কিন্তু আবার গণ্ডগোল লাগলো প্রতিমা বিসর্জনের সময়। কারা আগে বিসর্জন দেবে? তাঁতিরা না শুঁড়িরা?

মীমাংসা হ'লো না, অতএব বিসর্জনই হ'লো না প্রতিমার। ভাগের মা-দুর্গা অগত্যা যথাসময়ে বৃষ্টির জলে ধুয়ে-ধুয়ে গ'লে সাফ হ'য়ে গেলেন।

•

মহামায়ার মন্দিরের চত্বর রক্তে ভেসে যাচ্ছে। ধূপ আর ঘৃতের গন্ধে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে বাতাস।

প্রাতঃস্নানান্তে পূজোর জন্যে যথারীতি মন্দিরে এসেছেন পুরোহিত, তিনি একটুকাল থমকে দাঁড়ালেন। তারপর আস্তে-আস্তে ঢুকলেন মন্দিরের মধ্যে। দেবীপ্রতিমার চতুর্দিকে জমাট বেঁধে আছে রক্ত।

প্রতিমার সামনে এক প্রকাণ্ড চিনির নৈবেদ্য, একখানা চেলি, দক্ষিণার একটি স্বর্ণমুদ্রা, প্রায় এক হাজার রক্তজবা আর বিস্তর স্বর্ণালঙ্কার।

খানিকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে রইলেন পুরোহিত। তারপর মন্দিরের কাছাকাছি নদী থেকে জল এনে ধুয়ে ফেললেন রক্তের চিহ্ন। নৈবেদ্যের সমস্ত সম্ভার নিয়ে গেলেন বাড়িতে। ওটা পুরোহিতের পাওনা।

কিন্তু গোপনে রাজার মতো এত ঐশ্বর্য নৈবেদ্য সাজিয়ে পূজো দিয়ে গেলেন কে এবং কেন? কী বলি দিলেন? এত রক্ত কেন?

আর কেন, দু'চারদিন পরে মন্দিরের কাছাকাছি সেই নদী থেকে ভেসে উঠলো এক মুণ্ডহীন শব। সন্দেহ কি, মহামায়ার সামনে কোনো ক্ষমতাশালী ব্যক্তির সাধনাসিদ্ধির জন্যে উৎসর্গীকৃত হয়েছে এই হতভাগ্যের জীবন।

শুধু এই মহামায়ার মন্দিরে নয়, নরবলির খবর আরো অনেক আছে।

বর্ধমানের রঙ্কিনীশ্বরী দেবীর মন্দিরে প্রচুর নরবলি হয়েছে। এবং কারো-কারো ঘোরতর সন্দেহ, বর্ধমানের এসব নরবলির মূলে আছেন স্বয়ং বর্ধমানের রাজা। ঐ রাজবংশের কারো শক্ত ব্যামো হ'লেই নাকি সেই রোগমুক্তির জন্যে নরবলি দরকার। যুবরাজেরও বসন্ত হলো, নরবলিও হ'লো একটা। কিন্তু এসব নিয়ে রেখে-ঢেকে কানাকানি চলে, নালিশ চলে না। প্রমাণ কই?

যেন-তেন লোককে কি হাড়িকাঠে ফেলে বলি দিলে কাজ হয়?

না। বলির নর হবার ভাগ্য সকলের হয় না। তাকে স্বেচ্ছায় গলা পেতে দিতে হবে, তাকে পিতার একমাত্র পুত্র হ'তে হবে। পিতার একমাত্র পুত্র অন্যের জন্যে স্বেচ্ছায় গলা পেতে দেয় কেন? টাকায়?

না, শুধু টাকায় নয়। অন্য ভরসাও আছে। ভরসা দেন বলিদানের কর্তা। অবশ্যই তিনি বিজ্ঞ, মান্যগণ্যের একজন। ভরসা কী?

বলি হচ্ছে দেবতার তুষ্ট্যর্থে। অতএব মস্তকছেদের যে-কষ্ট সে তো কেবল ক্ষণেকের নিমিত্ত। তারপরে তো অবধারিত স্বর্গলাভ। সেখানে এই দেবতাই তোমার কাটামুণ্ডু ধড়ের সঙ্গে দিব্যি জুড়ে দেবেন। তখন আর কি। তারপর থেকে তো তুমি নিত্যানন্দে চির-স্থায়ী স্বর্গের বাসিন্দা।

নিচু ক্লাশের দুটি ছেলের লেখা প্রবন্ধ নিয়ে শুনিয়ে উঁচু ক্লাশের ছাত্রদের লজ্জা দেন ডাক্তার উইলসন। দ্যাখো, কী সুন্দর শুদ্ধ ইংরেজি। নিচু ক্লাশের দুটি ছেলে লিখেছে। রামগোপাল আর দক্ষিণারঞ্জন।

আরেকজন শিক্ষক আছেন হিন্দু-কলেজে, যিনি এদের বন্ধু, গুরু, সর্বস্ব। কে ? আর কে, ডিরোজিও।

আগে থাকতেন ভাগলপুরে, মাসিবাড়ি। সেখানে থাকবার সময় ডিরোজিও একা-একা গঙ্গাতীরে ঘুরে বেড়াতেন। ইংরেজি সাহিত্য আর দর্শন পড়তেন, কবিতা লিখতেন।

ভাগলপুরে থাকতেই একটা কবিতা লিখেছিলেন—ফকির অফ জাঙ্গিরা। সেটা প'ড়ে আমিও অনেককে মুগ্ধ হ'তে দেখেছি।

ভাগলপুর থেকে কলকাতায় এসেছিলেন কবিতার বই ছাপানোর ব্যাপারে। কিন্তু সেসময়েই উনি হিন্দুকলেজে চাকরি পেলেন।

ডিরোজিও চতুর্থ শ্রেণীতে সাহিত্য আর ইতিহাস পড়ান।

কিন্তু সব শ্রেণীর ছেলেরাই ডিরোজিওকে চায়। কলেজে ঢোকা মাত্র সবাই ডিরোজিওর চারদিকে ঘিরে দাঁড়ায়। ছুটির পরেও ডিরোজিও অনেকক্ষণ ব'সে ছেলেদের পড়াশোনায় সাহায্য করেন। নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন ছেলেদের সঙ্গে। তাতেও তৃপ্তি হয় না। বলেন—তোমরা আমার বাড়ি যেও।

আপন ছাত্রদের চিত্ত-চরিত্র যাতে বলিষ্ঠ হয়, এই উদ্দেশ্যে ডিরোজিও প্রতিষ্ঠা করলেন এক ছাত্রসভা—একাডেমিক এসোসিয়েশন। এখানে ডিরোজিওর ছাত্রেরা জ্ঞানানুশীলন করে, তর্কশক্তি সঞ্চয় করে।

করো, করো। গোঁড়ামি আর সঙ্কীর্ণতা থেকে মনকে মুক্ত করো। যে-কোনো বিষয়েরই হোক, শুধু একদিক জানলে চলবে না, এদিক-ওদিক দু'দিক জানো। আস্তিক্যের সপক্ষে ডকটর রীড আর ডুগালড ষ্টুয়াট্ পড়বার পাশে-পাশে পড়তে হবে আস্তিক্যের বিপক্ষে হিউমের

ক্লিন্থিস আর ফিলোর কথোপকথন। দু'কূল না চিনলে কেমন ক'রে পাবে সত্যসুন্দর সুধাস্বাদ ?

কৃষ্ণমোহন, রামগোপাল, দক্ষিণারঞ্জন, রসিককৃষ্ণ—এই একাডেমিক এসোসিয়েশনের প্রধান সভ্য। ডিরোজিওর শিষ্য।

ধর্মে ও সমাজে হিন্দুর কুসংস্কার এখন প্রায় চূড়ো স্পর্শ করেছে। হিন্দু আচার-আচরণ বহুস্থলে রুচিবিবর্জিত। যুক্তিবুদ্ধিশূন্য, কুসংস্কারাচ্ছন্ন। কিন্তু ধর্ম ও সমাজের এই হালই কি বহাল থাকবে ? হাওয়া-বদল হবে না ? স্রোত যাবে বন্ধ হ'য়ে ? একাডেমিক এসোসিয়েশনে এসব প্রশ্নাবলীও আলোচিত হ'তে লাগলো। কয়েকজন বাঙালী তরুণের এই আলোচনা-উদ্দীপনায় সভাস্থলে এসে উৎসাহ দিয়ে যান বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। চীফজাষ্টিস স্যর এডওয়ার্ড রায়্যান, লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের প্রাইভেট সেক্রেটারী কর্ণেল বেন্‌সন্‌, কর্নেল বীটসন, বিশপ কলেজের অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড ডব্লিউ এইচ মিল।

শুধু আলোচনাদি নয়, তরুণের দল আরো খানিক এগোলো। তাদের উৎসাহ অত্যধিক, আগ্রহ অপরিসীম। শুধু কথায় নয়, কাজেও তারা লঙ্ঘন করলো একাধিক লোকাচার বিধি।

লগ্ন বুঝে ডাক্তার ডফ আর্চ ডিকন ডিয়্যালট্রি কলেজের কাছে প্রচার করতে আরম্ভ করলেন খ্রীষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠতা, হিন্দুধর্মের নিকৃষ্টতা। এতদিন তবু একরকম, কিন্তু এসব বক্তৃতার ফল হ'লো মারাত্মক। প্রকাশ্যত, হিন্দুর অখাদ্য-কুখাদ্য খেতে লাগলো ডিরোজিওর শিষ্যেরা। ভাবলো, এই বুঝি হিন্দু-কুসংস্কার উচ্ছেদের পথ। এই নিশ্চয় সভ্যতার চিহ্ন। প্রগতির প্রতীক।

রামগোপাল আর দক্ষিণারঞ্জনের সঙ্গে রামতনু লাহিড়ী একদিন গিয়েছে ডিরোজিওর বাড়ি। সেখানে দু'বন্ধুই রামতনুকে খুব পীড়াপীড়ি করতে লাগলো—চা খাও।

কিন্তু কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান হ'য়ে রামতনু কেমন ক'রে ফিরিঙ্গির বাড়িতে চা খায় ?

না, রামতনু চা খাবে না।

অনুরোধে হ'লো না, দক্ষিণারঞ্জন জোর ক'রে চা খাওয়াতে চাইলো

রামতনুকে। অতঃপর চিৎকার করার উপক্রম করলো রামতনু,' তখন রক্ষা পেলো।

এখানে এক ফোঁটা চা পর্যন্ত রামতনুর ঠোঁটে ছোঁয়ানো গেলো না। আচ্ছা দেখি!

আরেকদিন দক্ষিণারঞ্জন রামতনুকে নিয়ে গেলো রেভারেণ্ড হাউয়ের বাড়িতে। সেদিন সেখানে বালক-সম্মিলন। হাউ সাহেবের মেয়েকে দক্ষিণারঞ্জন চুপি-চুপি একটা সাংঘাতিক প্ররোচনা দিয়ে এলো। সেই শুনে মেয়েটি এক গ্লাশ শেরি দিলো রামতনুকে। আর দক্ষিণা রঞ্জন রামতনুর কানে-কানে বললো—ইংরেজ সমাজের এই নিয়ম যে ভদ্রমহিলারা কিছু আহার বা পান করতে দিলে, তা আহার বা পান না করা অসভ্যতা। অতএব, পান না করো, একবার ওষ্ঠাধরে স্পর্শ করাও।

অগত্যা রামতনুকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঠোঁট লাগাতে হ'লো।

হিন্দু-কলেজে পাঠ সাঙ্গ হ'লো। তারপর দক্ষিণারঞ্জন বের করলেন একখানা সাপ্তাহিক পত্র—'জ্ঞানান্বেষণ'।

যা স্বাভাবিক, তাই হ'লো। এই নিয়ে বাবার সঙ্গে কিঞ্চিৎ মনোমালিন্য হ'য়ে গেলো দক্ষিণারঞ্জনের।

আগেও মতান্তর-মনান্তর হয়েছে। বাবার কথাবার্তা, ব্যবহারাদি পীড়িত করেছে দক্ষিণারঞ্জনকে। পর্যন্ত ডিরোজিওকে এ-বিষয়ে বলেছে একদিন। বলেছে—বাড়ি ছেড়ে না এলে আমার আর উপায় নেই।

কিন্তু গৃহত্যাগের পক্ষে ডিরোজিওর সমর্থন মেলেনি। না, বাবার কথায় অমন রাগ করতে নেই। ঢের সহ্য করতে হয়, ঢের সহ্য করতে হবে।

তখন সহ্য করেছিলো, কিন্তু এবারে আর করলো না। দক্ষিণারঞ্জন ঘর ছাড়লো। আস্তানা নিলো নতুন পাড়ায়, নতুন বাড়িতে। ডিরোজিওর বাস সেই পাড়ায়, সেই বাড়ির কাছাকাছি।

প্রায়ই ডিরোজিওর বাড়িতে নানারকম আলাপ আলোচনা চলে। বিষয় কখনো সাহিত্য, কখনো সমাজ, কখনো ধর্ম।

ডিরোজিওর বাড়িতে এত বার্তালাপ হচ্ছে যখন, আর দেখতে হবে না। প্রচারকের রসনা দু'খানা সংবাদ ছড়িয়ে দিলো। এক, দক্ষিণারঞ্জন খ্রীষ্টান হবে অবিলম্বে। দুই, ডিরোজিওর বোন এমিলিয়া আর দক্ষিণারঞ্জন প্রেমে পড়েছে, ওদের বিয়ে হবে।

একজনকে আমি চিনি, ডিরোজিওর নামে কুৎসা রটনা যার প্রায় দৈনিক কর্তব্য। বৃন্দাবন ঘোষাল। প্রাতে গঙ্গাস্নানটি সেরে ঘরে-ঘরে ডিরোজিওর নামে যা-তা খবর বিলি ক'রে বেড়ায় বৃন্দাবন ঘোষাল। ডিরোজিও নাকি বলেছে—ঈশ্বর নেই, ধর্মাধর্ম নেই, পিতামাতাকে মান্য করা অবশ্যকর্তব্য নয়, ভাই-বোনে বিয়ে হ'লে দোষ নেই। মিথ্যুক কোথাকার!

ডাক্তার ডফ বিস্তর স্নেহ করতেন দক্ষিণারঞ্জনকে। তিনি-হেন ব্যক্তি চেষ্টা ক'রে পারেননি, তবে আর কে পারবে দক্ষিণারঞ্জনকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দিতে? ফুঃ।

আর প্রেম? তা আছে এমিলিয়ার দক্ষিণারঞ্জনের প্রতি। কিন্তু ভ্রাতৃপ্রেম। এমিলিয়ার সেই ভালোবাসায় ডিরোজিওর সঙ্গে দক্ষিণা রঞ্জনেরও অংশ আছে।

সেই এমিলিয়া আর দক্ষিণারঞ্জন.........? বাজে কথা, একেবারে বাজে কথা। ওটা নিন্দুকের রটনা।

তবু সমাজপতিরা চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন। গেলো, হিন্দুকলেজ বুঝি ছারেখারে গেলো। এসবের একটা বিহিত এক্ষুনি করা চাই।

বিহিত আর কি, ডিরোজিও বিতাড়িত হলেন কলেজ থেকে।

পরমানন্দ আর দক্ষিণারঞ্জন। পিতা আর পুত্র। যতো মনোমালিন্যই হোক, পিতা-পুত্র দু'জনেরই মন কাঁদে। দুই আলাদা বাড়িতে দু'জোড়া চোখ, দু'খানা শরীর, দু'টি মন। কিন্তু এক জায়গায় না থাকতে পেলে দু'জনেরই ভারি কষ্ট।

দক্ষিণারঞ্জন আবার চ'লে এলেন বাবার কাছে। আবার দুয়ে মিলে এক। কিন্তু বিনাবাধায় পিতৃগৃহ বাস বুঝি দক্ষিণারঞ্জনের অদৃষ্ট-লিপি নয়।

ছ'জন বন্ধুসমেত রসিককৃষ্ণ মল্লিক একদিন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি এসে উপস্থিত। কিন্তু কৃষ্ণমোহন তখন বাড়ি নেই। তাতে আর কি হয়েছে, ওরা সাতজনে ব'সে নানারকম কথাবার্তা কইতে থাগলো। কথায়-কথায় আলোচনা চললো সমাজ সংস্কারের লাইনে।

ও-লাইনে অনেক আঁকিবুঁকি, অনেক জটিল-কুটিল প্রশ্নোত্তর, অনেক উত্তেজনা। সেই উত্তেজনার মাথায় একজন চ'লে গেলো মুসলমানের দোকানে। নিয়ে এলো গোমাংস।

আহারান্তে সকলে মিলে উচ্ছিষ্টাংশ ছুঁড়ে ফেললো পাশের বাড়িতে। হাতের জোরে হাড়ের টুকরো ছুঁড়ছে আর গলার জোরে চেঁচাচ্ছে—ঐ গোহাড়! ঐ গোমাংস!

পাশের বাড়ির বাসিন্দা দু'জন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ—ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্তী ও শম্ভুচন্দ্র চক্রবর্তী। ভৈরবচন্দ্র ঘরে নেই, শম্ভুচন্দ্র আছেন।

বাড়িতে গোরুর হাড় ফেলছে, এটা নিঃসন্দেহে ক্রুদ্ধ হবার মতো ঘটনা। পাড়া-পড়শিদের ডেকে একত্র হ'য়ে ওরা আক্রমণ করলেন এই উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের। দ্রুতপায়ে সবাই পালিয়ে গেলো।

কৃষ্ণমোহনের দাদার নাম ভুবনমোহন। শম্ভুচন্দ্র তাকে আপন বক্তব্য পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন। অবিলম্বে কৃষ্ণমোহনকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে। নইলে রক্ষা নেই।

এই নির্দেশ ভুবনমোহন শিরোধার্য করতে বাধ্য।

এ-ঘটনার কণামাত্রও কৃষ্ণমোহন জানে না। কিন্তু তার অনুপস্থিতিতে হ'লেও তার বন্ধু-বান্ধবদের কর্মফল তো তাকেই ভোগ করতে হবে। বাড়ি ফেরা মাত্র কৃষ্ণমোহন পেলো তার অপ্রার্থিত ফল, তার আশ্রয়ত্যাগের আদেশ।

অপ্রতিবাদে, অবাক্যব্যয়ে কৃষ্ণমোহন গৃহত্যাগ করলো। এই ঘরে আর তার অধিকার রইলো না। তার পরিজন পর হ'য়ে গোলা। আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে এই বুঝি তার চিরবিদায়।

কিন্তু গৃহত্যাগ ক'রেও কি নিস্তার আছে? উন্মত্ত হিন্দু প্রতিবেশিরা ওকে প্রহার করতে উদ্যত। কারো-কারো সঙ্কল্প আরো মহৎ—শুধু প্রহার নয়, একেবারে প্রাণনাশ।

ক্ষণকালের জন্তেও কেউ তাকে আশ্রয় দিতে রাজি নয়। তাহ'লে কি সে নিরাশ্রয় হ'য়ে গেলো, নির্বান্ধব হ'য়ে গেলো ?

না, দক্ষিণারঞ্জন আছে। সেই অমায়িক, পরোপকারী, বন্ধুবৎসল দক্ষিণারঞ্জন। কৃষ্ণমোহনের বন্ধু।

সত্যি-সত্যি বন্ধু যার আছে, তার আশ্রয়ও আছে। দক্ষিণারঞ্জনের ঘরে আশ্রয় পেলো কৃষ্ণমোহন।

সেখানে ব'সে কৃষ্ণমোহন একখানা পঞ্চাঙ্ক নাটক লিখলো—দি পারসিক্যুটেড। তাতে উল্লিখিত হ'লো হিন্দুদের ধর্ম ও আচার-ব্যবহারাদির প্রভূত নিন্দা।

কৃষ্ণমোহন আর দক্ষিণারঞ্জন—এই তুই বন্ধুর নামে আরেকটা খবর র'টে গেলো এই সময়। কৃষ্ণমোহন অবিলম্বে খ্রীষ্টান হবে। আর, তারই প্ররোচনায়, দক্ষিণারঞ্জনও নাকি দীক্ষিত হবে খ্রীষ্টধর্মে।

সেদিন দক্ষিণারঞ্জন বাড়ি নেই। দক্ষিণারঞ্জনের বাবা পূজাহ্নিক সেরে বাইরের ঘরে যাচ্ছেন, এমন সময় তাঁর কানে এলো এই তুঃসহ রটনা। শেষ পর্যন্ত, তাঁর ছেলে এই কৃষ্ণমোহনের প্ররোচনায় স্বধর্মত্যাগী হবে ? খ্রীষ্টান হবে ?

অসহ্য, অসহ্য। এই চিন্তা পর্যন্ত অসহ্য। চোখ পড়লো কৃষ্ণ মোহনের ওপর। এই কৃষ্ণমোহনই তো সব গণ্ডগোলের মূল ?

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হলেন। পা থেকে কাঠের খড়ম খুলে তিনি নিক্ষেপ করলেন কৃষ্ণমোহনের দিকে।

তারপর চললো তীব্র ভৎসনার পালা। সবশেষে আদেশ হ'লো—তুমি অবিলম্বে আমার গৃহ পরিত্যাগ করো।

অপমানিত কৃষ্ণমোহন বন্ধু-পিতার আদেশে তন্মুহূর্তে পরিত্যাগ করলো বন্ধুদত্ত আশ্রয়।

বাড়ি ফিরে এসে দক্ষিণারঞ্জন সব শুনলো। আশ্রিত অতিথির প্রতি পিতার এই তুর্ব্যবহারে তার মর্মবেদনা হ'য়ে উঠলো অপরিসীম। তার অসামান্ত বন্ধুবৎসল হৃদয়ের পক্ষে এই আঘাত নিদারুণ। যে-গৃহ থেকে তার আশ্রিত বন্ধু সলাঞ্ছনে বিতাড়িত হয়, সেখানে সে কেমন ক'রে নিশ্চিন্তে নিঃশ্বাস নেবে ?

দক্ষিনারঞ্জন দ্বিতীয়বার পিতৃগৃহ ত্যাগ করলো।

দেশহিতব্রত, সংবাদপত্র সম্পাদনা তো আছেই, উপরন্তু দক্ষিণারঞ্জন সদর আদালতে ওকালতি করেন। একদিন ওকালতি বক্তৃতা দিচ্ছেন বিচারকের সামনে, বিচারক কী যেন একটা রূঢ় বাক্য বললেন।

এই বিচারকের একটু দুঃখের ইতিহাস আছে।

উনি যখন নতুন সিবিলিয়ান, তখন কলকাতায় একটা ভাড়া বাড়িতে থেকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পড়াশোনা করতে যেতেন। যে-বাড়িতে ভাড়া থাকতেন, সেটার মালিক ছিলেন গোপীমোহন ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জনের প্রমাতামহ।

একদিন হয়েছিলো কী—সেই বাড়ির বাগানে একজন হিন্দু ভদ্রলোকের একটা গোরু ঢুকে পড়েছিলো। ইনি মজা দেখবার জন্যে সদর দরজা বন্ধ ক'রে কয়েকটা পোষা ডালকুত্তা লেলিয়ে দিয়েছেন। গোরুটা প্রাণভয়ে করুণস্বরে যতো চেঁচায়, ইনি ততো ফুর্তি বাসেন। আশে-পাশের হিন্দুরা ভেবে পেলেন না, কী উপায়ে এই নিষ্ঠুর যুবকের কবল থেকে গোরুটাকে উদ্ধার করা যায়।

তখন গোপীমোহন ঠাকুর পাল্কি চেপে ওখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। সবাই তাঁকে বললো ব্যাপারটা। কী, হিন্দুর বাড়ির মধ্যে এমন নিষ্ঠুর কাণ্ড? উত্তেজিত হ'য়ে গোপীমোহন সিংহ-দরজা ভেঙে বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন।

সেদিন এই বিচারক উত্তম-মধ্যম খেয়েছিলেন গোপীমোহনের কাছে। এবং, নিঃশব্দে সহ্য করেছিলেন সেই প্রচণ্ড অপমান।

যাকগে। এখন ইনি যে রূঢ় বাক্যটি বললেন, দক্ষিণারঞ্জনের আত্মসম্মান আহত হবার পক্ষে তাই যথেষ্ট। দক্ষিণারঞ্জন নির্ভীক, দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—বিচারাসন থেকে যে-কথা আপনি বললেন, তার উত্তর এখানে দেওয়া উচিত হবে না। আদালতের বাইরে আমি এর উপযুক্ত উত্তর দেবো।

সঙ্গে-সঙ্গে দক্ষিণারঞ্জন আদালত ছেড়ে বাইরে এসে অপেক্ষা করতে লাগলেন—কখন বিচারক সাহেব বেরিয়ে আসেন!

বিচারক সাহেব গোপীমোহনকে ভোলেননি। স্থানবিশেষে সাহেবদের স্মৃতিশক্তি অতি প্রখর। আর, গোপীমোহন যে এই দক্ষিণারঞ্জনের প্রমাতামহ—এ-তথ্যও সাহেবের অজানা নয়।

আদালতের বাইরে আমি উপযুক্ত উত্তর দেবো। —দক্ষিণারঞ্জনের এই সঙ্কল্পবাক্য সাহেব পুঙ্গবকে যৎপরোনাস্তি বিচলিত করেছে। দ্বারকানাথ ঠাকুরকে ডাকিয়ে এনে সাহেব অনুরোধ করলেন—আপনি দক্ষিণারঞ্জনকে শান্ত করুন।

অনেক বুঝিয়ে তবে দ্বারকানাথ দক্ষিণারঞ্জনকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনলেন।

আঠার

মেয়েদের লেখাপড়া নিয়ে দু'দলে প্রায় লাঠালাঠির উপক্রম। তুমুল তর্কাতর্কি। আঃ, বারোমাস কলকাতায় একটা-না-একটা হাঙ্গামা লেগেই আছে!

যা বলবার, কোনো ঘোরপ্যাঁচ না রেখে সরাসরিই বলছেন বিরোধী পক্ষ:

আচ্ছা, স্ত্রীলোকের লেখাপড়ার দরকার কিসের? তাদের লেখাপড়া দিয়ে কোন কর্মটা হবে, শুনি?

যদি বা হয়, তবু জিজ্ঞেস করি, কর্মের জন্যে দেশে কি উপযুক্ত পুরুষের অভাব আছে? শুধু দেশেই বা কেন, দুনিয়ায় এমন কোন পুংবর্জিত স্থান বিধাতা নির্মাণ করেছেন যেখানে পাটোয়ারগিরি, মুহুরিগিরি, নাজিরী, জমিদারি, জমাদারি কিম্বা আমীরি স্ত্রীলোক ছাড়া অচল?

যদি বলো, পারমার্থিক জ্ঞানার্জনের জন্যে স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা প্রয়োজন, তবে বলি—এ-হেন বাক্য উন্মত্ত প্রলাপ। অআকখ, ফলা-বানান, আঙ্ক-আঙ্ক শিখলেই কি তাবৎ জ্ঞান জন্মাবে? না। বাঙলা ভাষায় এমন কোনো গ্রন্থ নেই যা পাঠ করলে পারমার্থিক জ্ঞানোদয় সম্ভব। আর বিদ্যাসুন্দর, রসমঞ্জরী প্রভৃতি পুঁথি প'ড়ে যে-বিদ্যা হয়, সে-বিদ্যা প্রায় সব স্ত্রীলোকেরই যথেষ্ট আয়ত্ত। ঈশ্বর করুন, সে-বিদ্যা যেন লোপ হয়।

তাছাড়া ধর্মজ্ঞানের জন্যে মেয়েদের পুঁথি-পত্রপাঠ তো অবান্তর প্রসঙ্গ। কে না জানে, স্ত্রীলোকের পতিসেবাই পরম ধর্ম। কিন্তু বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করলে মেয়েরা আস্তে-আস্তে ভুলে যাবে এই পরমধর্মের কথা, নির্লজ্জা হ'য়ে উঠবে ক্রমশ।

তবে স্ত্রীলোকদের যদি সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাস করানো যায়, সেটা অবশ্যি উত্তম কথা। কিন্তু সে-আশা যাকে বলে সুদূরপরাহত। ব্যাকরণ, কাব্যালঙ্কার, সাংখ্য পাতঞ্জলাদি, ষড়দর্শন—এ-সব অত্যন্ত

কঠিন বিষয়। ব'লে ইয়া-ইয়া পুরুষেরা ঘায়েল হ'য়ে যাচ্ছে, সেখানে স্ত্রীলোকের কথা আসে কিসে!

আর পরপুরুষের চোখের সামন দিয়ে মেয়েরা ড্যাং-ড্যাং ক'রে পাঠশালায় যাবে, এটাই বা কেমন কথা? রাস্তায় অশিষ্ট দুষ্ট পুরুষের অভাব নেই। লোভের জ্বালায় ওরা ছলে-কৌশলে মেয়েদের লক্ষ্য ক'রে নির্ঘাত নানারকম কুবচন ছাড়বে। শেষকালে কি স্ত্রীশিক্ষার দৌলতে কুলাঙ্গনারা বারাঙ্গনা হ'য়ে যাবে? ছি, ছি, ছি।

লেখাপড়া শিখবে মেয়েরা, কিন্তু শেখাবে কে? অবশ্যই পুরুষ। কিন্তু কে না জানে, ঘৃতকুম্ভসমা নারী তপ্তাঙ্গার সমঃ পুমান্। পুরুষের মন অতি মত্ত এবং স্ত্রীলোকেরও তাদৃশ যথা সুবেশং পুরুষং দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং যদিবা সুতং ইত্যাদি-ইত্যাদি। অতএব, পুরুষের নিকট স্ত্রীলোকের বিদ্যাভ্যাস সর্বপ্রকারেই অসম্ভব।

ততো কথায় দরকার নেই। মোটের মাথায়, স্ত্রীশিক্ষা আমাদের পূর্বপুরুষের রীতিবহির্ভূত। অতএব, হবে না। ব্যস্।

উনিশ-বিশ বছর অবধি মিশনারি সাহেবেরা নানা কাণ্ড কারখানা করেছেন, কিন্তু তাতে স্ত্রীশিক্ষার কিছু উনিশ-বিশ হয়নি। সাহেবেরা বাজারে-বাজারে বালিকা পাঠশালা খুলেছেন; তারপর বিদ্যা বিতরণার্থে সেখানে এনে ঢুকিয়েছেন বাগ্দী, ব্যাধ, বেদে, বেশ্যা আর বৈরাগী বালিকাদের। কিন্তু তার ফল হয়েছে কেবল ফলা-বানান পর্যন্ত। অধিক হয়নি, হয় না, হ'তে পারে না। এসব দেখে-শুনেও হালে যারা স্ত্রীশিক্ষার জন্যে কোমর বেঁধে লেগেছেন, তারা স্বেচ্ছানুসারে কর্ম করুন। তবে আমরা আগেই একটা ভবিষ্যদ্বাণী ক'রে রাখি। আমরা ধর্ম মানি, আমরা অনেক দেখে-শুনে-বুঝে এখন প্রৌঢ় হয়েছি, আমরা ব'লে রাখি—এই স্ত্রীশিক্ষায় বিন্দুমাত্র ইষ্ট সম্ভাবনা নেই, কিন্তু অনিষ্ট সম্ভাবনা প্রচুর।

আরেকটা কথা। বে-বাবুরা আপন বিবিদের গুণবতী করতে কৃতসঙ্কল্প, তাদের আমরা নিষেধ করি না। বিবিরা পাঠশালায় যাক। আমরা বরং বিকেলে, রাত্রে অবাধে দুয়েকবার পাঠশালায় গিয়ে গুণবতীদের গুণ পরখ ক'রে আসবো। আজ্ঞে, হ্যাঁ।

স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধবাদীদের বিস্তর বাগবিস্তারের সারমর্ম তো শুনলাম, এবার আরেক পক্ষের বক্তব্যটাও শুনি :

শাস্ত্রে স্ত্রীশিক্ষা নিষিদ্ধ ? কস্মিনকালেও না। বরঞ্চ শাস্ত্রেই আছে— সস্ত্রীকোধর্ম্মমাচরেৎ। এই বচনানুসারে স্পষ্টই প্রতীয়মান যে সমুদয় যাগযজ্ঞ ক্রিয়া ধর্মপত্নী ব্যতিরেকে অসাধ্য। স্ত্রী যদ্যপি মূর্খা হয়, তবে কি শ্রৌতস্মার্ত যাজ্ঞিকী ক্রিয়া উত্তমরূপে নির্বাহ সম্ভব ?

আরো একটা বার্তা উঠেছে, স্ত্রীশিক্ষা নাকি আমাদের রীতি বহির্ভূত। এটা বিশুদ্ধ বাজে কথা।

পরপুরুষের চোখের সামন দিয়ে মেয়েরা পাঠশালায় যাবে, আপত্তির এটাও একখানা হেতু। বেশ কথা। কিন্তু গঙ্গাস্নানের জন্যে পর-পুরুষের চোখের সামন দিয়ে মেয়েরা যখন গঙ্গায় যায়, তখন ? আর শুধু এ-ই নয়, শত-সহস্র দেশী-বিদেশী পুরুষের সামনে মেয়েরা যখন গঙ্গায় সর্বাঙ্গ দেখিয়ে দর্শনাবগাহন করেন, তখন এ-সব ধর্মপুত্তুরদের আপত্তি থাকে কোথায় ? অ, আপত্তি বুঝি কেবল পাঠশালার নামে।

স্ত্রীলোকের পতিসেবা পরমধর্ম। কারো-কারো বদ্ধমূল বিশ্বাস, বিদ্যাভ্যাসের ফলে মেয়েরা এই পরম ধর্ম বিস্মৃত হবে ; সেবা দূরস্থান, শিক্ষার অহঙ্কারে অবজ্ঞা করতে আরম্ভ করবে পতিদের। তর্ক না ক'রে এখানেও একখানা উদাহরণ রাখি।

রাজা শিবচন্দ্র রায় বাহাদুরের কন্যার নাম হরসুন্দরী। পাঁচ বছর বয়সে এক কিশোরী বৈষ্ণবীর কাছে হরসুন্দরীর বর্ণপরিচয় হয়। তারপর আপন উৎসাহে হরসুন্দরী রাজবাড়ির একজন স্বস্ত্যয়নি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাছে কিছু সংস্কৃত শেখেন।

তখন রামায়ণ প্রথম ছাপার অক্ষরে বেরিয়েছে। হরসুন্দরী একদিন একা-একা নিজের ঘরে গুনগুন ক'রে পড়ছে। না, ভয় নেই। এ-সময়ে বাবা বাড়ির ভেতরে আসেন না।

কিন্তু সেদিন, কী জানি কেন, বলা-কওয়া নেই শিবচন্দ্র হঠাৎ বাড়ির ভেতরে ঢুকলেন। শুনলেন মৃদু গুঞ্জন। কান পাতলেন। রাজা বাহাদুরের বিস্ময় চরমে উঠলো। এ-ঘরে রামায়ণ পাঠ করে কে ?

বাবার সাড়া শুনে হরসুন্দরীর প্রাণে ভয় লাগলো। চোখের পলকে

হরসুন্দরী রামায়ণখানা লুকিয়ে ফেললো। তারপর বাবার সামনে দাঁড়ালো: হরসুন্দরী। লজ্জা পেয়েছে।

শিবচন্দ্র রায় একজন রাজা বাহাদুর। বুদ্ধিমান, বিদ্যানুরাগী। এই রাজা বাহাদুরের পয়সায়ই চন্দ্রিকা মুদ্রালয় থেকে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ সুন্দর ছাপা হ'য়ে বেরিয়েছে। প্রত্যেকখানার দাম বত্রিশ টাকা। অথচ তার থেকে রাজা বাহাদুর এক পয়সাও নেননি। সব নিয়েছেন চন্দ্রিকা সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এমন রাজা বাহাদুরের মেয়ে হরসুন্দরী!

লুকিয়ে বই পড়ছিলো ব'লে মেয়ে ভয় পেয়েছে, লজ্জা পেয়েছে। রাজা বাহাদুর মুহূর্তে ব্যাপারটা আগাপাশতলা বুঝে নিলেন। কিন্তু ভয় কী, লজ্জা কী।

রাজা বাহাদুর বললেন—তুমি কদ্দুর লেখাপড়া শিখেছো, কী-কী পড়েছো, বলো। ভয় নেই।

খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সব শুনলেন মেয়ের মুখে। তারপর বিশহাজার টাকার কোম্পানির কাগজ লিখে দিলেন মেয়ের নামে। সেই টাকায় মেয়ে ইচ্ছেমতো সংস্কৃত বই কিনতে লাগলো। প্রচণ্ড পড়াশোনা চালালো।

যথাসময়ে হরসুন্দরীর বিয়ে হ'য়ে গেলো। শ্বশুরবাড়িতে বৌ-ঝিদের গ্রন্থপাঠ নিষিদ্ধ। ছী-ছি, কুলবধূ বই পড়লে কি সংসারের মান থাকে?

প্রকাশ্যে হ'লে যখন মান থাকে না, তখন গোপনেই চললো। যেমন ক'রেই হোক, গ্রন্থপাঠ ছাড়া হরসুন্দরীর চলে না।

চোদ্দ বছর বয়সে হরসুন্দরীর সন্তান হয়। সূতিকাগার থেকে বেরিয়ে এসে সন্তানকে কোলে নিয়ে দুধ দিতে-দিতে বই পড়তো হরসুন্দরী। আট বছর বয়সে সন্তান শিক্ষকের কাছে ফারসী ভাষা পাঠ সুরু করলো। হরসুন্দরী নিজে স্বয়ং রূপন্যায়ালঙ্কারের কাছে সযত্নে শিখতে লাগলো মহাভারত-পুরাণাদির গূঢ়তত্ত্ব!

রাত চারটার সময়ে হরসুন্দরী ঘুম ছেড়ে উঠে পুরাণ নিয়ে বসতেন। সকালে হাত-মুখ ধুয়ে একা-একা যেতেন এক পবিত্র কুঠুরিতে। নৈবেদ্যের আয়োজন নেই, পুষ্পপাত্রাদি পর্যন্ত না; অথচ সেই কুঠুরিই

তার পূজাগৃহ। সেখানে কম্বলাসনে কিঞ্চিৎকাল মৌনী হ'য়ে তিনি ঈশ্বরের আরাধনা করতেন। জ্ঞানযোগে যার পূজা, তার উপচার লাগে না। অনেক পণ্ডিত এবং কবিকে নিয়মিত মাসিক বেতন দেন হরসুন্দরী।

হরসুন্দরীর স্বামীর নাম লোকনাথ মল্লিক। সে ইন্দ্রিয়সুখ ছাড়া কিছু বোঝে না, জানে না ; জানতেও চায় না, পেতেও চায় না।

—বই পড়ো। বইয়ের মধ্যে সব পাবে। পৃথিবীর সমস্ত রস ওখানে আছে। —কখনো কখন হরসুন্দরী স্বামীকে বলতেন। কিন্তু স্বামীর বই পড়তে ব'য়ে গেছে। ওসব কথা উঠলে তখনকার মতো একটু লজ্জা পেয়ে বৌয়ের কাছ থেকে পালিয়ে যেতো।. ব্যস্।

কিন্তু হরসুন্দরীর ক্ষান্তি নেই। হবিষ্যাসিনী হলেন। সন্ধ্যার পর বামে-দক্ষিণে দুই আলো জ্বালিয়ে রাত দু'পহর অবধি পুরাণ-মহাভারত পড়েন।

পর্বের দিনে কয়েকজন স্ত্রীলোক নানারকম চোখ-ধাঁধানো সাজসজ্জা ক'রে হরসুন্দরীর কাছে এসেছে। হরসুন্দরীর সেই সাধারণ সাজ-পোষাক। ও মা, সে কী কথা।

—আচ্ছা, একদিনের জন্যেও কি তোমার ভালো শাড়ি-গয়না পরতে নেই ?

না। হরসুন্দরীর কাছে—নক্ষত্রে ভূষণং চন্দ্রো নারীণাং ভূষণং পতিঃ। পৃথিবী ভূষণং রাজা বিদ্যা সর্ব্বত্র ভূষণং ॥

অনাস্থ ভূষণ নারীর কাছে বাহুল্য, নিষ্প্রয়োজন। হরসুন্দরীর ভূষণ—বিদ্যা আর পতি।

অবশ্যি এসব খবরেও কারো-কারো গাত্রদাহ হ'তে পারে। হ'তে পারে কি, হচ্ছে।

এ-কথা পর্যন্ত এক ব্যক্তি সজোরে বলেছেন যে অতীতে রাণী ভবানী প্রভৃতি কয়েকজন মহিলা বিদ্যাভ্যাস ক'রে ভালো কাজ করেন নি, অকর্তব্য করেছেন।

হায়-হায়, বলিহারি যাই! সম্ভবত রাণী ভবানীর ধারে-কাছে উক্ত ব্যক্তির মতো কোনো বিবেচক উপস্থিত ছিলেন না।

এ-কথা অনায়াসবোধ্য যে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে সুশিক্ষিত না হ'লে দেশের শ্রীবৃদ্ধি সুদূরপরাহত। তথাপি স্ত্রী-শিক্ষায় কারো-কারো প্রবল আপত্তি। তবে ভরসার কথা, বিরুদ্ধবাদীদের দল আছে, কিন্তু কোনো সদ্‌যুক্তি নেই। শুধু গলাবাজি।

একজন প্রৌঢ় স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহে প্রায় উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছেন। পাঠশালা তেমন চালু হ'লে তিনি নাকি অবাধে সেখানে বিবিদের গুণপরীক্ষার্থ দুয়েকবার গতায়াত করবেন।

করুন। কিন্তু তার ফলে অবশ্যম্ভাবী উপায়ে প্রাণটা প্রৌঢ় বয়সে বেঘোরে হারালে কি খুব ভালো কথা হবে ?

তবে পূর্বাহ্নে সেই প্রৌঢ়ের উদ্দেশ্যে একটু সংবাদ ব'লে রাখি। কোনো প্রৌঢ়া কিম্বা যুবতীর পাঠশালায় যাবার প্রস্তাব এ-যাবৎ ওঠে নি। শুধু যে-মেয়েরা বয়স্থা নয়, তাদেরই যাবার কথা।

আহা গো, প্রৌঢ়ের মনোবাঞ্ছা এবার বুঝি পূর্ণ হ'লো না!

উনিশ

ভ্রমণ-কাহিনীটা আমি শুনলাম রাজনারায়ণ বসুর মুখে।

কোনো বাঙালী যদি লেণ্ডোর বা মসুরী পর্যন্ত যান তো লোকের চোখে তিনি বীরপুরুষ। সেই বাঙালীর আবার ভ্রমণ-কাহিনী কিসের?

কিন্তু রাজনারায়ণের মুখে যেটা শুনলাম, সেটা বিশুদ্ধ ভ্রমণ-কাহিনীই বটে।

রামগোপাল ঘোষের বাড়ি ইংরেজিতে কৃতবিদ্য ব্যক্তিবর্গের প্রধান আড্ডাস্থল। তিনি 'এজুরাজ', অর্থাৎ এজুকেটেডদের রাজা। হিন্দু-কলেজের প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্রদের তিনি অধিনায়ক।

এই রামগোপাল ঘোষ একখানা ষ্টিমারের মালিক। ছোটো ষ্টিমার, পদ্মফুলের মতো বহিরঙ্গ। ষ্টিমারটির নাম—লোটাস। যথার্থনামা।

কলের জাহাজে চেপে বঙ্গদেশের দূরস্থ স্থানভ্রমণ—এ তো বিলক্ষণ একটা দুঃসাহসিক কাণ্ড। কিন্তু সেবার পূজোর সময় রাজনারায়ণ বসু স্থির করলো, ঘোষমশায়ের সঙ্গে সে-ও যাবে, সে-ও ভাসবে। রাজনারায়ণ হিন্দু-কলেজের ছাত্র।

রাজনারায়ণ নিশ্চিত জানে যে মা এই ভ্রমণের বিন্দু-বিসর্গ টের পেলেও যেতে দেবেন না। কিন্তু যেতে হবেই।

অগত্যা বাবার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে একটা উপায় ঠিক হ'লো।

—মাকে বলা হবে যে আমি এবার পূজোয় রামগোপাল বাবুর সঙ্গে তার বাড়ি বাঘাটি যাচ্ছি, তারপর বাবা আস্তে-আস্তে—।

বাবা তাতে রাজি। ঠিক আছে।

জাহাজে উঠবার দিন, সকলের উৎসাহের আর সীমা-পরিসীমা নেই। সকাল-সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে সবাই গিয়ে হাজির হ'লো রামগোপাল ঘোষের বাড়িতে। সকলের হাতে একেকটি কাপড়ের মোট।

প্রথমে নামতে হ'লো ম্যালেরিয়া-জীর্ণ ত্রিবেণীতে। রামগোপাল বাবুর নিজগ্রাম বাঘাটি হ'লো ত্রিবেণীর কাছে। সেই বাঘাটিতে পূজোর কয়েকদিন কাটলো।

এখানে একটা কথা আছে। যদিও ভ্রমণ-কাহিনীর আওতার মধ্যে পড়ে না, তবু রাজনারায়ণ একটা তথ্য বলেছে। রামগোপাল বাবু নাকি পূজোর কাজ-কর্ম কিছু করেন নি। সেসব করেছেন রামগোপাল বাবুর সম্পর্কিত একজন বৃদ্ধ। কেবল শান্তিজল নেবার দিন রামগোপাল বাবু শান্তিজল নিলেন।

যাক গে। ত্রিবেণী থেকে জাহাজ চললো মুরশিদাবাদের দিকে। মহানন্দে কেটে যাচ্ছে দিনগুলি। আহারাদির ব্যবস্থাও চমৎকার। সকালে চা-বিস্কুট-ডিম, দুপুরে ভাত-ডাল-মাছের ঝোল, রাত্রে ইংরেজি কিম্বা হিন্দুস্থানী খানা।

সকাল-বিকাল দু'বেলা জাহাজ থেকে তীরে নেমে দল বেঁধে কয়েকজন যায় পাখি-শিকারে। পাখির অদৃষ্টে যেদিন মৃত্যু থাকে, সেদিন অবশ্য-অবশ্য এদের অদৃষ্টে পক্ষীমাংস ভক্ষণ।

একদিন রামগোপাল বাবু রাজনারায়ণকে পিস্তল ছুঁড়তে দিলেন।

রাজনারায়ণ বললো—আমি কখনো পিস্তল ছুঁড়িনি, ভয় হচ্ছে পাছে হাতখানা উড়ে যায়।

রামগোপাল বাবু অম্লানবদনে বললেন—গেলোই বা।

এই আপাতকঠোর উদাসীন উক্তির মধ্যে না জানি কতোখানি সাহসবিস্তৃত অর্থ প্রচ্ছন্ন হ'য়ে আছে!

নবদ্বীপ পার হ'য়ে ষ্টিমার নোঙর করা হ'লো। মদনমোহন তর্কালঙ্কার বিল্বগ্রামে আছেন, তাঁকে তুলে নিয়ে যেতে হবে। তর্কালঙ্কার মশাই সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক, উপরন্তু সুকবি, একজন বিখ্যাত ব্যক্তি।

তর্কালঙ্কার মশাইকে সঙ্গে নিয়ে ষ্টিমার আবার চললো মুরশিদাবাদের দিকে।

মুরশিদাবাদের ঘাটে যখন জাহাজ নোঙর নামালো, তখন কোত্থেকে মাল-বোঝাইকরা একটা ভড় সজোরে এসে পড়লো 'লোটাসের' ওপর। শত হ'লেও লোটাস কৃশাঙ্গী, ভড় লম্বোদর। ফলে, লোটাসের অঙ্গে লাগলো, বিলক্ষণ অঙ্গহানি হ'লো।

লোটাসের সব আরোহীই কিছু শান্তশিষ্ট নয়। কয়েকজন ঐ ভড়ে উঠে মাঝিদের উত্তম-মধ্যম লাগালো।

এই উত্তম-মধ্যমের পরে লোটাসের পক্ষে এখানে থাকা আর উত্তম কর্ম হবে না। চলো, লোটাস চলো। চলো যাই, ভাগীরথী ও পদ্মার সঙ্গমের দিকে চলো।

সেখান থেকে রাজমহল।

নবাবী আমলের অট্টালিকার কঙ্কাল সকল কালের সকলকে স্মরণ করিয়ে দেয়—প্রচুর পার্থিব গৌরব, বহু আশা-ঐশ্বর্যের শেষ পরিণাম এই ভগ্নাবশেষ।

সেই অবশিষ্টাংশের মধ্যে আছে কালো পাথরের সিংহ-দালান। এখানে ব'সে নবাব প্রত্যহ দরবার করতেন!

পিছনে প'ড়ে রইলো নবাবী আমলের শ্রুতকীর্তি ঐশ্বর্যের মৃত-কায়া, লোটাস চললো গঙ্গা নদীর খাড়ি বেয়ে রাজমহল পর্বতের দিকে। কিছুদূর পর্যন্ত চললো সেই যাত্রা। সবাই দেখলো পাহাড়, দেখলো পাহাড়িয়াদের বন্যনৃত্য, শুনলো পাহাড়িয়াদের আরণ্যগীতি।

রাজমহল থেকে তারপর জাহাজ চললো মহানন্দা আর পদ্মার সঙ্গমস্থলাভিমুখ লক্ষ্য ক'রে। এই পথে জলদস্যুর ভয়!

তাই ডেকের ওপর ভালো ক'রে পাহারা দিতে হয়। মাথায় প্যাগড়ি বেঁধে, হাতে তলোয়ার নিয়ে রাজনারায়ণ পাহারা দেয়।

মহানন্দায় জাহাজ প্রবেশ করলো। মহানন্দার জল আকাশবর্ণ, তীরস্থ বন-উপবন ঘনশ্যামল। আগে এপথে কখনো কোনো বাষ্পীয় পোত আসেনি। মহানন্দার মধ্য দিয়ে লোটাস যখন ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে চললো, গ্রাম্যজনেরা হৈ-হল্লা করতে লাগলো—ধোঁয়া কলের লা এয়েছে রে। ধোঁয়া কলের লা এয়েছে রে॥

নদীর পাড়ে এসে গাঁয়ের লোক ভীড় ক'রে ধোঁয়া-কলের লা দেখতে লাগলো।

কিন্তু ষ্টিমার থেকে নেমে দুধ কিনবার জন্যে গাঁয়ের মধ্যে ঢুকেও—আরে, এত সব লোকজন গেলো কোথায়?

ধোঁয়া কলের লায়ে চ'ড়ে যারা আসে, তারা নিশ্চয়ই কোনো অদ্ভুত জীব। যে জন্যেই হোক, অদ্ভুত জীব যখন ডাঙায় নেমেছে, তখন গাঁয়ের লোক কোন ভরসায় দাঁড়িয়ে থাকে?

অতএব, সবাই পালিয়েছে। গ্রাম শূন্য।

ভোলাহাটের কাছে ষ্টিমার পড়লো বিষম খরস্রোতের সামনে। কোনোক্রমেই ষ্টিমার নিয়ে আর 'কড়কড়ে পানী' ঠেলে এগিয়ে যাওয়া যায় না।

অবস্থা দেখে সবাই গিয়ে তখন রামগোপাল বাবুকে বললো— আর অগ্রসর হবার দরকার নেই। এবার ঘরে ফিরে যাওয়া যাক।

ফিরে যেতে হবে?

কিন্তু অসমসাহসিক কার্যে রামগোপাল বাবুর প্রবল অনুরাগ। তার চরিত্র আরেক রকম। এমন নাকি অনেকবার হয়েছে যে বন্দুকের গুলি ওর শরীরের খুব কাছ দিয়ে গিয়েছে কিন্তু ওকে স্পর্শও করে নি। উনি বলেন, ওর জীবন মন্ত্রপূত। বলেন—আই বেয়ার এ চার্মড লাইফ।

ফিরে যেতে হবে?

না, রামগোপাল বাবু বললেন—না। আমাদের অভিধানে ফিরে যাওয়া ব'লে কোনো কথা লেখা নেই। ষ্টিমারের এঞ্জিনে সম্পূর্ণ জোর দিয়ে অগ্রসর হ'তে হবে। হবেই। সেজন্যে যদি বয়লার ফেটে আমরা আকাশে উড়ে যাই তো তাতেও ক্ষতি নেই।

ফিরে যাওয়া যাবে না। না, না, না।

তখন অধিকাংশ জিনিস-পত্র জালিবোটে ক'রে তীরে নামিয়ে ষ্টিমার হাল্কা করা হ'লো।

অতঃপর পরিপূর্ণ শক্তিতে চালিত হ'লো এঞ্জিন, পুনঃপুনঃ উদ্গীরিত হ'লো গাঢ় বাষ্পরাশি। ঈশ্বরের দয়ায় ষ্টিমার পার হ'য়ে এলো বিপজ্জনক জলের এলাকা।

'ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়'—এটা রামমোহন রায়ের একটা গানের লাইন। পরিবেশের প্রয়োজনে 'অন্যের' পরিবর্তে 'জলেরই' শব্দটি লাগিয়ে রামগোপাল গান ধরলেন—ভয় করিলে যাঁরে না থাকে জলেরই ভয়।

মালদহে নেমে সবাই অতিথি হ'লো সেখানকার ডেপুটি কলেক্টর

বাবুর বাড়িতে। তাঁর আদর-আপ্যায়ন বহুকাল মনে রাখার মতো।

মালদহ থেকে আট ক্রোশ দূরে গৌড়নগরের ভগ্নাবশেষ। সে-স্থান এখন নিবিড় বনাকীর্ণ, বাধাবিঘ্নবহুল।

যদিও দলের সঙ্গে কয়েকটা বন্দুক আছে, তবু জোগাড় করতে হ'লো আরো কয়েকটা বন্দুক, কয়েকটা হাতি। সবাই হাতির পিঠে চ'ড়ে যাবে।

সে-যাত্রায় আরেকজন সঙ্গী জুটলেন, মালদহের সিবিল সার্জন সাহেব।

তিনি আর রামগোপাল বাবু এক হাতির ওপর, বাকি সবাই উঠলো অন্যান্য হাতিতে।

তর্কালঙ্কার মশায়ের সাজসজ্জা অবশ্যি চমৎকার হয়েছে। ওর পরণে কোট-পেন্টুলন, হাতে বন্দুক কিন্তু হাওয়ায় মাথার টিকি উড়ছে ফরফর ক'রে। এই বেশে উনি হস্তিপৃষ্ঠে উপবিষ্ট। অহো, কী দৃশ্য!

যেতে-যেতে এই তর্কালঙ্কার মশাই হাতির পিঠ থেকে প'ড়ে গেলেন। কিন্তু হাতিটা খুব শিক্ষিত, সঙ্গে-সঙ্গে থমকে দাঁড়ালো। কপালগুণে তর্কালঙ্কার মশাই অল্পের জন্যে বেঁচে গেলেন। যদি আর এক পা-ও বাড়াতো হাতিটা তো আর দেখতে হ'তো না। তর্কালঙ্কার মশাই একেবারে চেপ্টে যেতেন।

গৌড়ে পৌঁছে সবাই বিশ্রাম নিলো কোতোয়ালি দরজায়। সাহেব আর রামগোপাল বাবু একত্রে খানাপিনা করলেন। বাকি সবাই আলাদা। কয়েকজন জংলী যাচ্ছিলো, তাদের থেকে মোষের দুধ কিনলো আর খিচুড়ি রাঁধলো। দিব্যি খাওয়া।

আহারান্তে সবাই ঘুরে-ঘুরে দেখলো অতীত কীর্তির স্মৃতিচিহ্ন।

এই দেওয়ান-খানা।

দেওয়ান-খানার প্রাচীরে-প্রাচীরে অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য। মধ্যে-মধ্যে কোরাণ থেকে উদ্ধৃত বাণী আরবী ভাষায় উৎকীর্ণ।

এখানে প্রত্যহ বাদশাহের দরবার বসতো।

সিংহাসনে বসতেন স্বয়ং বাদশাহ, তার কাছে নতজানু হ'য়ে বসতেন উজীর-অমাত্যেরা। অনতিদূরে দণ্ডায়মান হ'য়ে অপেক্ষা করতো সুবিচার-প্রার্থী প্রজাপুঞ্জের একটা জনতা।

এখন তারা সব কোথায় গেলো? তারা ধুলোর সঙ্গে ধুলো হ'য়ে গেছে, হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া, তারা সব শূন্য হ'য়ে গেছে।

বাদশাহ কি কখনো ভেবেছিলেন তার ঐশ্বর্য, তার কীর্তি চিরকাল থাকবে না? ভেবেছিলেন, এ-স্থান একদিন বনাকীর্ণ হবে? একদিন হিংস্র জন্তুর বাসস্থল হবে? ব্যাঘ্রসঙ্কুল হবে?

প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড কয়েকটা হ্রদবৎ পুষ্করিণী প'ড়ে আছে। তাতে ভাসছে কয়েকটা বড়ো-বড়ো কুমীর।

এই অত্যুচ্চ স্তম্ভাকৃতি গৃহ তখন কোন কাজে লাগতো?

রাত্রে রাজ-জ্যোতির্বেত্তা এখানে উঠে নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করতেন। তার মাথায় থাকতো সুন্দর উষ্ণীষ, পরণে থাকতো আপাদলম্বিত আলখাল্লা।

সেই রাজ-জ্যোতির্বেত্তা এখন কোথায়?

কিন্তু আকাশে এখনো নক্ষত্র আছে!

কুড়ি

মধু প্রেমে পড়েছে।

মেয়েটির নাম দেবকী বন্দ্যোপাধ্যায়। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ে।

মধুর গভীর ইচ্ছে, দেবকীকে বিয়ে করে। দেবকীরও বোধ করি সেই ইচ্ছা।

শুধু দেবকীকে বিয়ে করা নয়, আরো একটা বিশাল বাসনা আছে মধুর! বিলেত যাবে। যে-ইংরেজেরা পরের দেশ কলকাতাকে এমন অপরূপ ক'রে সাজিয়েছে, তারা আপন দেশ বিলেতকে কেমন বানিয়েছে? গিয়ে দেখতে হবে। সাজানো-বানানো বাদ দিলেও কথা আছে। বিলেত মধুর স্বপ্নসঙ্গী সেক্সপীয়র-মিল্টন-বায়র্নের স্বদেশ। সে-দেশ কি নিজের চোখে না দেখলে চলে? মধুর দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

কিন্তু সে-আকাঙ্ক্ষার পথেও বাধা-বারণের অন্ত নেই। বিলেত-যাত্রীর নামে আমাদের সমাজ ছী-ছি করবে, থুথু ফেলবে। তবু মধুর বাসনা দমে না, আকাঙ্ক্ষা কমে না।

মধু হিন্দু-কলেজের সেরা ছাত্র। গায়ের রঙ কালো, কিন্তু দেখতে বেশ সুশ্রী; সতেজ শরীর, প্রশস্ত কপাল, দুটি বড়ো-বড়ো চোখ। চমৎকার ফারসী গজল গায়। ইংরেজিতে এমন কবিতা লেখে যে অনেক অধ্যাপক অবধি মুগ্ধ। মধুর বিশ্বাস, মহাকবি হবার জন্যেই তার জন্ম হয়েছে। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সে খোলাখুলি বলে—আমি পৃথিবীর সকল কবিকে ছাড়িয়ে যাবো। তোমরা আমার জীবন-চরিত লিখো।

এই মধুর স্বভাব। তার মনে-মুখে এক। কোনো রাখা-ঢাকা নেই। ছলনা-বঞ্চনায় সে অনভ্যস্ত। সে ঢাকতে জানে না, পালাতে জানে না।

ছেলেবেলায় একদিন খুড়তুতো ভাইয়ের সঙ্গে মধু গিয়েছিলো খেজুররস চুরি করতে। দু'জনেই গাছে উঠেছে, এমন সময় যার গাছ

সে টের পেয়ে দিলো তাড়া। খুড়তুতো ভাই সঙ্গে-সঙ্গে পালালো, কিন্তু মধু পালাতে জানে না।

পালাতে যে জানে না, তার নামে কলঙ্ক লাগবে না তো কার নামে লাগবে ?

ছেলেবেলার কথা উঠলেই মন একটানে সাগরদাঁড়ী চ'লে যায়। জন্মভূমি, শৈশবধাত্রী সাগরদাঁড়ী। তিনদিকে কপোতাক্ষীর স্রোতলীলা।

কপোতাক্ষীর জল, জলের কপোতাক্ষী। ঘননিবিষ্ট বৃক্ষশ্রেণী, শাখায়-শাখায় সম্বদ্ধ হ'য়ে স্থানে-স্থানে নদীর বুকে অবনতমুখী। শ্যামল তৃণভূমি নদীতট থেকে জলরেখা পর্যন্ত প্রসারিত হ'য়ে আছে। কতো নৌকো এই নদী বেয়ে যাওয়া-আসা করে !

কপোতাক্ষীর পশ্চিমে প্রান্তরবিস্তীর্ণ শ্যামলিমা। নদীর দু'কূলে গাছ-পালার আড়ালে চাষাচাষীর কুটিরের চিত্রাভাস। মাঝে-মাঝে দু'একটা পুরোনো বট, পুরোনো অশ্বত্থ। অপরূপ অরণ্যশোভা।

আর গ্রীষ্মরাত্রে যখন জ্যোৎস্না নামে, তখন কপোতাক্ষীর জলস্রোত যেন দুগ্ধস্রোত হ'য়ে যায়। তখন কপোতাক্ষীর তরঙ্গমর্মরে কলকল অমৃতধ্বনি। স্থান-কালের বহুবিঘ্ন পার হ'য়ে সেই মায়ামর্মর কলকাতায় মধুর কানে আসে।

সাহিত্য প্রাণে লেগেছে, অতএব যথানিয়মে অঙ্কে মধুর আকর্ষণ কম। অঙ্কের চুল-চেরা নিয়ম-কানুনে মন ভরে না।

অঙ্কের নামে অনেকেরই অবশ্য আতঙ্ক সুরু হয়। অঙ্কের অধ্যাপক হলেন রিজসাহেব। ক্লাশে তার আসার সময় হ'লে কোনো-কোনো ছেলে দিব্যি রেলিং টপকে কেটে পড়ে।

মাথায় ঢুকতো না, সেকথা আলাদা। চমৎকার বোঝে-শোনে, কিন্তু অঙ্কে মধু একেবারেই মনোযোগ দিতে চায় না। প্রথম-প্রথম রিজসাহেব অনেক বুঝিয়েছেন, কিন্তু মধুর আরেক রকম মন। গণিত থাক। সাহিত্য হোক। অতঃপর বাধ্য হ'য়ে রিজসাহেব হাল ছেড়েছেন।

এই ক্লাশে ভূদেব মুখোপাধ্যায় অসাধারণ অঙ্ককুশল। উপরন্তু, আচার-আচরণে, পোষাক-আষাকে ভূদেব আগাপাশতলা বাঙালী।

মধু হাফ-সাহেব, আধা-বাঙালী। মধুর মুখে 'বাবু' নেই। হয়

'মিষ্টার' অথবা 'এস্কোয়ার'।

কিন্তু, কী আশ্চর্য, দু'জনে অপার বন্ধুত্ব। ক্লাশে দু'জনে একসঙ্গে বসে। যা মধু পড়ে, যা মধু লেখে, ভূদেবকে সবটুকু না পড়ালে তার তৃপ্তি নেই।

প্রায়ই ভূদেবের বাড়িতে যায় মধু। হয়তো গায়ে-মাথায় ধুলো লেগেছে, ভূদেবের মা ঝেড়ে-মুছে চুল আঁচড়ে দেন। খেতে বসান। মায়ের কাছে ভূদেব আর তার বন্ধু অভিন্ন।

একবার ষোলো মাসের মাইনে বাকি পড়লো ভূদেবের। মাসিক পাঁচ টাকা হিসেবে ষোল্যে মাসের বকেয়া আশি টাকা শোধ ক'রে আবার মাসে-মাসে পাঁচ টাকা মাইনে গোণা? সে-আশা কম। ভূদেবের বাবা একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিত। বোধ করি তার সাধ্যে এতখানি কুলোবে না, ভূদেবেরও আর এখানে পড়া চলবে না।

টের পেয়ে মধু ভূদেবকে ধরলো। —তুমি নাকি হিন্দুকলেজে পড়া বন্ধ করবে?

ভূদেব বললো—হ্যাঁ। আমাদের অবস্থা তো বোঝো। বাধ্য হ'য়েই আমাকে পড়া বন্ধ করতে হবে।

ক্ষুণ্ণ গলায় মধু বললো—কেন ভাই, টাকার জন্যে তোমার পড়া বন্ধ হবে! আমি তো মায়ের কাছ থেকে অনেক টাকা জলপানি পাই, আমার টাকা থেকে তোমার বেতন দেওয়া চলতে পারবে।

হয়তো তাই হ'তো। কিন্তু ভাগ্যক্রমে ভূদেব সেবার বৃত্তি পেয়ে গেলো। মধুর থেকে তাই ভূদেবকে টাকা নিতে হ'লো না। কিন্তু বৃত্তি না পেলে ভূদেব নিতো, নিশ্চয়ই নিতো। মধুর টাকা নিতে ভূদেবের কুণ্ঠা হ'তো না। মধু তার অতি আপনার জন। তার পরম বান্ধব।

গৌরদাস বসাক, ভোলানাথ চন্দ্র, রাজনারায়ণ বসু—এরাও মধু-ভূদেবের সহাধ্যায়ী। ভূদেবের সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে, তবু ভূদেব সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন। বন্ধুরা গোলদীঘিতে গিয়ে এন্তার মদ গেলে। ফটক দিয়ে ঘুরে বেরোলে, একটু বেশি সময় লাগে, তাই বন্ধুরা রেলিং টপকে গিয়ে তাড়াতাড়ি শিক-কাবাব কিনে আনে। সভ্যতা মানেই

সাহেবী, আর সাহেবী মানেই মদ-মাংস। অতএব, ঢেলে চালাও। কিন্তু ভূদেব ওসবে নেই। সে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঙালী ; হৃদয়ব্যাপ্ত বাঙালিয়ানার প্রভাবে এখানে সে সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন। সে নিভৃত, সে নিঃসঙ্গ, সে একা।

ভূদেবের সঙ্গে মধুর একদিন তুমুল তর্ক। বিষয় সেই সেক্সপীয়র আর নিউটন ; কে বড়ো ?

ভূদেবের নিউটন। মধুর সেক্সপীয়র।

মধু বলে—সেক্সপীয়র চেষ্টা করলে নিউটন হ'তে পারতেন, কিন্তু নিউটন চেষ্টা করলে কখনো সেক্সপীয়র হ'তে পারতেন না।

এ তো বিশ্বাসের কথা হ'লো, তর্কের সিদ্ধান্ত কোথায় ? সেক্সপীয়র নিউটনের থেকে অধিকতর প্রতিভাবান, এ-কথার প্রমাণ কী ? চেষ্টা করলে কে পারতেন তা কি বলা যায় ?

অগত্যা মধু তখনকার মতো চুপ। কিন্তু তারপর গোপনে-গোপনে চললো তার অঙ্কচর্চা।

তিনমাস পরে একদিন রিজসাহেব ক্লাশে একটা দুরূহ অঙ্ক দিলেন। কেউ পারে না। ক্লাশের সবাই মুখ নিচু ক'রে ব'সে আছে।

তখন মধু আরম্ভ করলো। প্রায় শেষ ক'রে এনেছে, এমন সময় চোখ পড়তে ভূদেব তো অবাক। কথাটা ভূদেবই বললো রিজসাহেবকে।

তারপর রিজসাহেবের কথায় সকলের সামনে বোর্ডে অঙ্কটা নির্ভুল ক'ষে দিলো মধু। ফিরে এসে ভূদেবের গা টিপে বললো—কেমন, সেক্সপীয়র চেষ্টা করলে যে নিউটন হ'তে পারতেন, তা দেখলে তো ? কিন্তু আমার গণিত শেখা এই পর্যন্ত শেষ।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত একদিন এই ভূদেবের কথায়ও মধু বিরক্ত হ'লো। সেদিন মধু ফিরিঙ্গি কায়দায় চুল কেটে এসেছে। ঘাড়ের চুলগুলো ছোটো ক'রে ছাঁটা, সামনের চুলগুলো বড়ো-বড়ো। ভূদেবকে দেখিয়ে মধু বললো—দেখ দেখি, কেমন চুল কেটেছি। এর জন্যে আমার এক মোহর লেগেছে।

দেখে-শুনে ভূদেব বললো—এ কী করেছো ? তোমার পক্ষে এ ঠিক হয়নি। তুমি একজন জিনিয়াস ; জিনিয়াস যারা, তারা নতুন-

নতুন বিষয় উদ্ভাবন করে। তুমি যদি পাঁচ চুড়ো, সাত চুড়ো কি ন'চুড়ো কেটে আসতে, তাহ'লে যা হোক একটা নতুন রকম কিছু হ'তো। তা না ক'রে ফিরিঙ্গির মতো চুল কেটে এসেছো। এমন নীচ অনুকরণ প্রবৃত্তিটি ভালো নয়।

সেদিন আর মধু বরাবরের মতো ভূদেবের কাছ ঘেঁষে বসলো না, একটু তফাতে বসলো। আহা, ভূদেব ভাবলো, মধুকে অমন ক'রে বলা ভালো হয়নি। নিশ্চয়ই মধু মনে ব্যথা পেয়েছে।

পরদিন মধু আর কলেজে এলো না।

কলেজে আসেনি, কিন্তু বাড়িতেও নেই। আছে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের মধ্যে। সেখানে কী?

আর কী, মধু খ্রীষ্টান হবে। তাই বিধিব্যবস্থা ক'রে কেল্লায় ঢুকেছে যাতে বাইরের কারো জারিজুরি না খাটে। মধুর আপন ইচ্ছার সঙ্গে মিশনারিদের কৌশলের যোগাযোগে কেল্লার দরজা মধুর কাছে অবারিত হ'য়ে গেছে।

কিছুদিন আগে মধুর সঙ্গে একটি সুন্দরী, সম্ভ্রান্ত জমিদার কন্যার বিয়ের প্রস্তাব ওঠে। কিন্তু সে-প্রস্তাবে মধুর প্রবল অনিচ্ছা।

অনিচ্ছা না হাতি। মধুর মা-বাবা ভাবলেন, ওসব ছেলেমানুষের কথা।

পাকা দেখা অবধি হ'য়ে গেলো। তখন মধু মাকে বললো—মা, এ-কাজ কেন করলে; আমি তো বিয়ে করবো না।

সে কী কথা! মা মধুকে বোঝাতে লাগলেন, ভাবী বৈবাহিকের কতো ধনমান, কন্যার কতো রূপগুণ।

কন্যার রূপগুণ? সেকথা মধু আমলে আনে না। —মা, তুমি যতই বলো, বাঙালীর মেয়ে রূপে-গুণে কখনো ইংরেজের মেয়ের শতাংশের একাংশও হ'তে পারে না।

সাংঘাতিক কথা। কলকাতায় দু'একটি হিন্দুর ছেলে খ্রীষ্টান হ'য়ে গেছে, এ-কথা মা জানেন; অস্থির হ'য়ে ভাবলেন, বিয়ে দিলে হয়তো মধুর মন ভালো হ'য়ে যাবে। দেখি, যাতে বিয়েটা তাড়াতাড়ি হ'য়ে

বাবা এক কালাপাহাড়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন? —মধু ভাবে। —কিন্তু আমি কিছুতেই এ-বিয়ে করবো না। আমি এমন কাজ করবো যে সেজন্যে বাবাকে চিরকাল দুঃখ করতে হবে।

মধু খ্রীষ্টান হবেই। হুঁ, গোপনে-গোপনে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে মধু কিছুদিন থেকে একটু ঘন-ঘন আনাগোনা করছিলো বটে। তাছাড়া কে একজন সাহেব নাকি মধুকে আশা দিয়েছে, খ্রীষ্টান হবার পরে তার বিলেত যাবার ব্যবস্থা ক'রে দেবে।

রাজনারায়ণ দত্ত কলকাতার একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তার ছেলেকে লোভ দেখিয়ে কেল্লায় আটকে খ্রীষ্টান বানাবে—মিশনারিদের এতখানি দুঃসাহস? রাজনারায়ণের অধীনে অনেক লাঠিয়াল-শড়কিওয়ালা। তিনি দেখে নেবেন। তিনি মিশনারিদের দেখিয়ে দেবেন বাঘের বাচ্চা কেড়ে নিলে তার ফল কতোদূর গড়ায়।

কিন্তু এখন হুঙ্কার তুললে কী হবে? ছেলেবেলা থেকে অমন পুতু-পুতু আদর পেলে কোনো ছেলে এমন উচ্ছৃঙ্খল না হ'য়ে পারে?

ছেলেবেলায় মধু যখন স্নান করতে যেতো, তখন নাকি পাঁচ-সাতটা উনুনে হাঁড়ি চড়ানো হ'তো। স্নান সেরে ফিরে এসে যে-হাঁড়ির ভাত সুসিদ্ধ হ'তো, তাই খেতো মধু।

প্রস্থ-প্রস্থ পোষাক-আষাকের বাহার ছেড়ে দিই, কিছুদিন আগে গৌর বসাক স্বচক্ষে দেখেছে, রাজনারায়ণ বাবু তামাক খেয়ে আলবোলার নলটা ছেলের হাতে দিয়েছেন। ছেলের বেপরোয়া মদ খাওয়ার কথা জেনে-শুনেও রাজনারায়ণ ছেলেকে কিছু বলেন নি। ওসবে তিনি নাকি কিছু মনে করেন না।

একলা মধুকে দোষ দিয়ে কী হবে, মা বাবার আদরে-আদরেই ছেলেটা গোল্লায় গেলো।

কিন্তু মা-বাবার দিকটা কেউ একবার খতিয়ে দেখবে না? মধুর জন্মের চার বছরের মধ্যে আরো দুটি ছেলে হয়েছিলো, প্রসন্নকুমার আর মহেন্দ্রনারায়ণ। এক বছর আর পাঁচ বছর বয়সে দু'জনেই চ'লে গেলো। আর কোনো সন্তানাদি হয়নি তারপর। মধু একচ্ছত্র। মা বাবার একমাত্র সম্বল। জীবনান্তে মা বাবার জলপিণ্ডদানের একমাত্র

অধিকারী। আহা, সেই ছেলে একটু বেশি আদর-অভ্যর্থনা পাবে না? হয়তো মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, কিন্তু মা-বাবার স্নেহ ভালোবাসা কি সবসময় মাত্রা মেনে চলে? আর, বলো, মাত্রাছাড়া আদরের জন্যেই কি কারো ছেলে কখনো খ্রীষ্টান হয়?

হয় না, কিছুই হয় না। লাঠিয়াল—শড়কিওয়ালা নিয়ে কেল্লা থেকে ছেলে ছিনিয়ে আনা যায় না। সে-পথ বন্ধ।

ভূ-কৈলাসের রাজা সত্যশরণ ঘোষাল গিয়েছিলেন কেল্লায়। কিন্তু তাকে কেল্লার মধ্যে ঢুকতে দিলে না। গৌর ও ভূদেব গেলো, তারাও ফিরে এলো। আরেকদিন দেখা হবে!

সেদিন গৌরদাস একা একা মধুর সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি পেলো। দেখা হ'তে মধু সামান্য একটু হাসলো। যখন ধর্মান্তর হবে, তখন গান হবে। সে-গান নিজেই লিখেছে মধু। সেটা শোনালো প্রিয়তম বন্ধু গৌরদাসকে।

সেই গানটির মধ্য দিয়ে মধু ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিবেদন ক'রে দিয়েছে আপন হৃদয়—আকাশতলে যা আমার ভালোবাসার তার সর্বস্ব আমি তোমার জন্যে পরিত্যাগ করলাম, প্রভু!

তবে? তাহ'লে কি শুধু পার্থিব প্রলোভন নয়? এ-সঙ্গীত কি কেবল মধুর অতিবেল হৃদয়ের সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাস? নাকি দুর্দাম বিদ্যুতগতির অনিবার্য-ফলপ্রসব? অথবা, এই বিঘ্নবিকীর্ণ পন্থাবরণের হেতু মধুও নির্ভুল জানে না?

ওল্ড-মিশন চার্চে আর্চে-ডিকন ডিল্‌ট্রীর কাছে মধু খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা নিলো। ফেব্রুয়ারী মাসের ন'তারিখ, আঠারোশো তেতাল্লিশ। সেদিন থেকে আর শুধু মধুসূদন নয়, মাইকেল মধুসূদন।

·

বিধর্মী হ'য়ে গেছে, তবু মাঝে-মাঝে ঘর থেকে ডাক আসে। মায়ের অবস্থা প্রায় উন্মাদিনীর মতো, বাবার ডাকে মাঝে-মাঝে মধু বাড়ি যায়।

কিন্তু গোপনে, সমাজের চোখ এড়িয়ে। ধর্মত্যাগী ছেলেকে দেখে মায়ের শোক কিছু কমে, আগের মতো তিনি ছেলেকে সস্নেহে খেতে

দেন। তার ইচ্ছে থাকলেও ছেলেকে বাড়িতে রাখার উপায় নেই। সমাজ আছে, ভয় আছে।

প্রায়শ্চিত্তের পথ আছে, কিন্তু মধুর মত নেই। খ্রীষ্টান হ'য়ে সে কিছু পাপ করেনি, প্রায়শ্চিত্তও করবে না। যা আছে, তাই থাক।

খ্রীষ্টান, অতএব, হিন্দুকলেজে ঠাঁই নেই। ভর্তি হ'তে হ'লো বিশপ্স কলেজে। খ্রীষ্টান ছেলেকে মাসিক খরচ জোগাচ্ছেন হিন্দু বাপ।

বিশপ্স কলেজে মধু শিখতে সুরু করলো বিভিন্ন ভাষা। গ্রীক, লাটিন, সংস্কৃত। এখানে অনেক অধ্যাপক বহুভাষায় সুপণ্ডিত। মধুকেও বহুভাষা আয়ত্ত করতে হবে। আর যাই করুক, বিদ্যাভ্যাসে মধুর অনন্ত অনুরাগ। পড়াশোনায় তার ক্ষান্তি নেই, ক্লান্তি নেই।

গোপনে-গোপনে বাড়ি যায়, কিন্তু বাবার সঙ্গে গণ্ডগোল বেড়ে যাচ্ছে ক্রমশ। ধর্মত্যাগী ছেলেকে বাবা অনেক কথা বোঝান, তিরস্কার করেন কখনো-কখনো। মধু শাসন-অসহিষ্ণু, সংযমশূন্য। উদ্ধতভঙ্গিতে বাবার মুখের ওপর সে প্রত্যুত্তর দেয়।

আর সহ্য হয় না। রাজনারায়ণ ছেলের মাসিক খরচ বন্ধ ক'রে দিলেন।

একদিকে স্বামী, অন্যদিকে পুত্র। দুঃসহ যন্ত্রণাভোগ ছাড়া মধুর মায়ের আর কিছু করবার নেই।

খ্রীষ্টান হবার আগে মধুকে বিলেতে নিয়ে যাবার আশা দিয়েছিলেন একজন, কার্যকালে তিনি উধাও।

মধু অতিমাত্রায় মদ্যপ। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি।

মধুকে মদ ছাড়তে বলেছিলেন কৃষ্ণমোহন, কিন্তু মধু ছাড়েনি। মধুর মতো একজন মদ্যপায়ীর সঙ্গে কে মেয়ের বিয়ে দেয়?

বিলেত না, দেবকী না। কেউ না, কিছু না। বন্ধু নেই, আত্মীয় নেই। আশা নেই, আশ্বাস নেই। শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। একবিন্দু সহানুভূতি পর্যন্ত নেই। ঘুম নেই।

মধু খ্রীষ্টান হ'য়ে গেছে, অথচ কী কাণ্ড, বিসর্জনের বাজনা কানে

এলে এখনো ছেলেবেলার মতো মধুর ছু'চোখ জলে ভ'রে আসে।

অসহ্য, অসহ্য।

তার স্বদেশ, তার প্রবাস। তার পিতৃগৃহ, তার অরণ্য। কলকাতা অসহ্য।

শান্তি পেতে হ'লে কলকাতা ছেড়ে যেতে হবে। কোথায়? কোন সমুদ্রলগ্ন শহরে?

মাদ্রাজ। কাউকে কিছু না ব'লে মধু একদিন বাঙলাদেশ ছেড়ে চ'লে গেলো।

বাঙলায় মধু থাকলো না।

একুশ

বহুবার আমি বর্ধমানে গিয়েছি। বিস্মিত হ'য়ে বহুবার দেখেছি বর্ধমানের রাজবাড়ি। এই রাজ-পরিবারকে কেন্দ্র ক'রে বিধাতাপুরুষ যে-কাহিনী রচনা করেছেন, তার বহুলাংশ বিচিত্র রহস্যে আচ্ছন্ন।

কিন্তু যতবার ভাবি, ততবার আমার দুঃখ হয় প্রতাপচাঁদের জন্যে।

প্রতাপচাঁদকে আমি একাধিকবার দেখেছি, কিন্তু তেজচাঁদকে কোনোদিন চোখে দেখিনি। শুধু কানে শুনেছি তাঁর কথা। বিশ্বাস-যোগ্য সূত্রে পেয়েছি রাজা বাহাদুর তেজচাঁদের চরিত্রের যৎসামান্য পরিচয়।

প্রত্যেকদিন সকালে যখন অন্দরমহল থেকে বেরোতেন, রাজা বাহাদুরের হাতে থাকতো একটা সোনার খাঁচা। খাঁচার মধ্যে কতোগুলো ছোটো-ছোটো পাখি—লাল পাখি। রাজা বাহাদুর লাল পাখিগুলোকে বড়ো ভালোবাসতেন।

সে একেবারে আশ্চর্য ভালোবাসা।

একদিন সকালে রাজা বাহাদুর সেই লাল পাখির খাঁচা হাতে বেরিয়েছেন, এমন সময় একজন কর্মচারী সংবাদ নিয়ে এলো—মহারাজ, হুগলীতে খাজনা দাখিল করবার জন্যে সেদিন যে একলক্ষ টাকা পাঠানো হয়েছিলো, তা সেখানকার মোক্তার আত্মসাৎ ক'রে পালিয়েছে।

—চুপ রহো। —রাজা বাহাদুর বিরক্ত হ'য়ে বললেন—হামারা লাল ঘাবরায়েগি।

লাখটাকা গেছে যাক, কিন্তু কর্মচারীর কথার শব্দে লাল পাখি যেন ভয় না পায়, কষ্ট না পায়।

কোথায় লাখটাকা আর কোথায় লাল পাখি। কর্মচারী মশায়ের ভয়ঙ্কর রাগ হ'লো। আচ্ছা, ত্যাখা যাবে সেই মোক্তারকে। দেখি পাপিষ্ঠের থেকে সব টাকা আদায় করতে পারি কি না।

অনুসন্ধানে জানা গেলো—মোক্তারমশাই মহারাজের টাকায় পুকুর কাটাচ্ছেন, শিবমন্দির দিচ্ছেন, অতিথিশালা খুলছেন।

মোক্তারমশাইকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে রাজসরকার থেকে যথাযোগ্য ব্যবস্থা হ'লো। মোক্তারমশাইকে ধ'রে নিয়ে আসা হ'লো রাজবাড়িতে।

তেজচাঁদ বাহাদুর মোক্তারকে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি আমার এক লক্ষ টাকা চুরি করেছো?

মোক্তারমশাই বললেন—না, মহারাজ, আমি চুরি করিনি, আমি বাড়িতে নিয়ে গিয়েছি।

তেজচাঁদ বললেন—নিয়ে গেলে কেন?

মোক্তারমশাই বললেন—মহারাজের কাজে ব্যয় করবো ব'লে নিয়ে গিয়েছি। আমাদের গ্রামে একটিও শিবমন্দির ছিলো না, এখন মহারাজের পুণ্যে শিবমন্দির হয়েছে। আর, একটি অতিথশালাও করেছি।

তেজচাঁদ জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কি সব টাকাই এতে খরচ করেছো?

—আজ্ঞে না মহারাজ। আমাদের ওদিকে ভারি জলকষ্ট। আমি মহারাজের টাকায় একটা মস্ত পুকুর কাটিয়েছি। মহারাজের পুণ্যে সে-পুকুরের জল হয়েছে যেমন পরিষ্কার তেমনি সুস্বাদু—সেপাইদের জিজ্ঞেস ক'রে দেখুন।

তেজচাঁদ মোক্তারমশাইকেই জিজ্ঞেস করলেন—সে-পুকুর প্রতিষ্ঠা করেছো?

—আজ্ঞে না। —মোক্তারমশাই বললেন—টাকায় কুলোচ্ছে না।

তেজচাঁদ বললেন—এখন কতো টাকা পেলে প্রতিষ্ঠা করতে পারো?

মোক্তারমশাই বললেন—অন্তত আরো দু'হাজার।

—কিন্তু ভাখো, খবরদার! —তেজচাঁদ বললেন—দু'হাজারের একটি পয়সাও বেশি লাগলে আমি আর দেবো না।

মোক্তার নির্দোষ। মোক্তার চমৎকার করেছে। টাকা নিয়ে আমি আর এর থেকে ভালো কী কাজ করতে পারতাম—এ-সম্পর্কে এই হচ্ছে তেজচাঁদের ধারণা।

একটি-দুটি নয়, তেজচাঁদ বাহাদুরের সাকুল্যে সাত বিয়ে।

তখন মাঝারি বয়স তেজচাঁদের। একদিন পথের মধ্যে দেখতে

পেলেন একটি পরমা সুন্দরী মেয়েকে। কে এই মেয়েটি? খোঁজ-খবর নিতে তখনি মহারাজ লোক লাগালেন। এলো খবর। মেয়েটির বাবার নাম কাশীনাথ। অত্যন্ত গরীব। জগন্নাথ দর্শনে যাবেন। তাই সপরিবারে লাহোর থেকে এখানে এসে ছেন।

টাকায় কী না হয়। মহারাজ বিয়ে ক'রে ফেললেন মেয়েটিকে। সেই সূত্রে মেয়েটির বাপ কাশীনাথ বর্ধমানেই থেকে গেলেন। সঙ্গে রইলো তাঁর পুত্র পরাণ।

কাশীনাথের মেয়ে হলেন মহারাণী কমলকুমারী।

তেজচাঁদ শেষ বিয়েটি যখন করেন, তখন তিনি একেবারে বৃদ্ধ এবং তাঁর পুত্র প্রতাপচাঁদ যুবক।

তখন তেজচাঁদ বৃদ্ধ। তখন প্রতাপচাঁদই বিষয়-কর্ম রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

বয়সকালে প্রতাপচাঁদকে সবাই বলতো—ছোটো রাজা। অসামান্য তাঁর শক্তি, অসাধারণ তাঁর সাহস। কুস্তিতে, সাঁতারে আর অশ্বা-রোহণে তাঁর উদ্দাম উৎসাহ। শুনতে পাই, সাহেব ঠেঙাতেও নাকি তিনি কম ওস্তাদ ছিলেন না।

অল্প বয়সেই প্রতাপচাঁদ বিষয়-কর্ম দেখা-শোনা আরম্ভ করেছিলেন। অনেকে বলতো, মহারাণী কমলকুমারীর ভাই পরাণ তাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। প্রতাপচাঁদও নাকি তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তেজচাঁদের কাছ থেকে সমস্ত বিষয়-আশয়ের দানপত্র লিখিয়ে নিয়েছিলেন প্রতাপচাঁদ।

সে-ব্যবস্থা বিনষ্ট করবার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি পরাণবাবু, কিন্তু নিষ্ফল। কিছুকাল বাদে বৃদ্ধ রাজা তেজচাঁদের সঙ্গে পরাণবাবু বিয়ে দিয়ে দিলেন নিজের এক পরমাসুন্দরী কন্যার। এতকাল পরাণ বাবু ছিলেন তেজচাঁদের শালাবাবু, এবার থেকে হলেন শ্বশুরমশাই। যিনি শালা, তিনিই শ্বশুর। যিনি ভগ্নিপতি, তিনিই জামাইবাবাজী।

পরাণবাবুর কন্যা হলেন মহারাণী বসন্তকুমারী।

বেঁচে থাকলে অষ্টম গর্ভের সন্তান অসাধারণ হয়। পরাণবাবুর সর্বকনিষ্ঠ সন্তানের যখন জন্ম হ'লো, তখন সবাই তাই বলতে লাগলো। আর প্রতাপচাঁদ নাকি তখন বলেছিলেন—অষ্টমগর্ভের সন্তান বাঁচলে রাজা হয়, পরাণের ছেলে নিশ্চয়ই রাজা হ'য়ে আমার গদিতে বসবে। তোমরা একথা লিখে রাখো।

যিনি হাসলে ঘর ভ'রে যেতো, তিনি নিঃশব্দ। প্রতাপচাঁদ একেবারে অন্যরকম হ'য়ে যেতে লাগলেন। আগে প্রতিদিন অপরাহ্ণে বারদ্বারীর ছাদে উঠে তিনি দূরবীণ নিয়ে তাকিয়ে থাকতেন নীলপুরের দিকে। প্রতাপচাঁদ আর ছাদে যান না, দূরবীণ ছোঁন না। বহুব্যয়ে একটা আশ্চর্য স্নানাগার নির্মাণ করাচ্ছিলেন ; সে-স্নানাগার নির্মিত হ'লো, কিন্তু প্রতাপচাঁদ একবারের জন্যেও তা দেখতে গেলেন না। মোসাহেবদের সঙ্গেও দেখা-শোনা বন্ধ হ'লো।

কেবল দু'একটা কথা বলতেন শ্যামচাঁদ বাবুর সঙ্গে। আর সাক্ষাৎ করতেন চিনারির সঙ্গে। চিনারি একজন আর্টিষ্ট সাহেব। তিনি তখন প্রতাপচাঁদের একখানা প্রমাণ ছবি আঁকছিলেন।

কিছুদিন পরে প্রতাপচাঁদ নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেলেন। ভারি কাতর হ'য়ে পড়লেন তেজচাঁদ। বাবার কাছে অনাদর পাচ্ছে ব'লেই হয়তো প্রতাপচাঁদ বাবাকে ছেড়ে চ'লে গেলো। কোথায় গেলো ? কোথায় ?

একজন মুসলমান আমলার কাছে গোপনে খবর পেলেন তেজচাঁদ। তারপর সেবার প্রতাপচাঁদকে ফিরিয়ে আনলেন রাজমহল থেকে।

কিন্তু ফিরিয়ে আনলে কী হবে, প্রতাপচাঁদ আর তেমন ক'রে হাসেন না। তেজচাঁদ অনেক বোঝালেন, আদর-যত্ন করলেন, কিন্তু প্রতাপচাঁদ তেমনি নিঃশব্দ, তেমনি বিমর্ষ। যেন প্রতাপচাঁদ এ-জীবনে আর হাসবেন না।

একদিন সকালে প্রতাপচাঁদ খানসামাদের বললেন—আজ নতুন মহলে স্নান করবো।

সমস্ত ফোয়ারা খুলে দিলো খানসামারা, বাতাসে বাজতে লাগলো জলধারার শব্দ। প্রায় প্রহরখানেক স্নান করলেন প্রতাপচাঁদ। তারপর যখন বেরোলেন, চোখ রক্তবর্ণ, সমস্ত শরীর কাঁপছে।

সেদিন বিকেলে সবাই শুনলো—প্রতাপচাঁদ অসুস্থ।

আসগর আলীকে প্রতাপচাঁদ খুব পছন্দ করতেন। প্রথমাবস্থায় চললো আসগর আলীর চিকিৎসা। সে-চিকিৎসায় কোনো ফল হ'লো না। তারপর এলেন ডাক্তার কুন্টার সাহেব। প্রতাপচাঁদের গালে দশ-বারোটি জোঁক লাগিয়ে রক্তমোক্ষণের ব্যবস্থা দিলেন তিনি। তেজচাঁদ কিম্বা প্রতাপচাঁদ—কেউ রাজি হলেন না সে-ব্যবস্থায়। ডাক্তার সাহেব রাগ ক'রে বিদায় হলেন।

সেদিন কি তার পরদিন প্রতাপচাঁদ বললেন—আমায় গঙ্গাযাত্রা করাও।

রাজবল্লভ কবরেজ এলেন। তাঁরও মত হ'লো—গঙ্গাযাত্রা।

কালনায় নিয়ে যাওয়া হ'লো প্রতাপচাঁদকে। সঙ্গে গেলেন বৃদ্ধ তেজচাঁদ, আপন সম্পর্কের আর কেউ না। কালনার রাজবাড়িতে কয়েকদিন কাটলো। প্রতাপচাঁদের ক্রমশ রোগবৃদ্ধি হচ্ছে।

সেদিন রাত দেড় প্রহর। প্রতাপচাঁদকে পাল্কি ক'রে নিয়ে যাওয়া হ'লো গঙ্গাতীরে। কানাত দিয়ে ঘাট ঘিরে হ'লো প্রতাপচাঁদের অন্তর্জলি। কানাতের বাইরে অনেক লোকজন। যদিও আট-দশটা মশাল জ্বলছে, কিন্তু তাতে কী হবে। ঘনকৃষ্ণ অন্ধকার রাত্রি। পৌষের প্রচণ্ড শীত।

সেই অন্ধকার শীতের রাত্রে বৃদ্ধ পিতাকে শুনতে হ'লো যুবক পুত্রের মৃত্যু-সংবাদে। ইহসংসারে বোধ হয় পুত্রশোকের তুল্য আর কোনো শোক নেই। তিনপ্রহর রাতে বৃদ্ধ তেজচাঁদ বর্ধমান ফিরে গেলেন।

দু'চারদিন বাদেই উঠলো আরেক গুঞ্জন—প্রতাপচাঁদ মরেন নি, পালিয়েছেন।

তেজচাঁদ সে-বিষয়ে কোনো কথা বললেন না।

কিছুদিন পরে উঠলো পোষ্যপুত্রের কথা। কিন্তু না, তেজচাঁদ পোষ্যপুত্র নেবেন না।

আবার কিছুদিন পরে, আবার পোষ্যপুত্রের কথা। সে-প্রস্তাবে তেজচাঁদ তখনো অসম্মত। শুধু বললেন—আমার প্রতাপ আসবে, সে অবশ্য আসবে।

কিন্তু যদি প্রতাপচাঁদ ফিরে না আসেন, কিম্বা আসতে যদি তাঁর দেরি হয়? আর, এর মধ্যে যদি মহারাজ তেজচাঁদ দেহত্যাগ করেন, তবে তো এই সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি কোম্পানি বাহাদুর দখল করবেন। যাতে কোম্পানী বাহাদুর তা না করতে পারেন, অন্তত সেজন্যে একটা ব্যবস্থা ক'রে রাখা দরকার।

অনেক আলাপ-আলোচনার পর স্থির হ'লো তেজচাঁদ পোষ্যপুত্র নেবেন। নেবেন কি, নিলেন।

তেজচাঁদ পোষ্যপুত্র নিলেন পরাণবাবুর পুত্রকে।

পরাণবাবুর পুত্র হ'লো রাজপুত্র। নতুন নাম হ'লো তার—মহাতাপচাঁদ।

তারপর পনেরো বছর কেটে গেছে।

১৮৩৫ সালে বর্ধমানে এলেন একজন সন্ন্যাসী। তখন বর্ধমান আর আগের মতো নেই। বর্ধমান বদলে গেছে, বর্ধমানে তখন ইংরেজি কায়দায় রাস্তা হয়েছে, আর রাস্তার পাশে বিলিতি ফুল। কৃষ্ণসায়রের ওদিকে আর জঙ্গল নেই, জায়গায়-জায়গায় সুন্দর নামওয়ালা সুন্দর-সুন্দর বাগান। কেবল রাজবাড়ির বাইরের দিক আগের মতো অপরিচ্ছন্ন, কিন্তু ভিতরে আর আগের মতো নেই। অনেক নতুন-নতুন মহল হয়েছে রাজবাড়ির মধ্যে। পায়রার সংখ্যা বেড়েছে। ফাক্তা, কুমরি—চিড়িয়াখানার সেসব পুরোনো পাখিরা ম'রে গেছে, এখন সব নতুন পাখি।

সন্ন্যাসী রাজবাড়িতে ঢুকলেন, চারদিকে চোখ মেলে দেখতে লাগলেন। সন্ন্যাসী কারো কাছে কিছু জানতে চাইলেন না, কেউ সন্ন্যাসীকে কোনো নিষেধ করলো না।

তারপর বারদ্বারী। সেখানে গিয়ে সন্ন্যাসী দেখলেন, বহুকালের অযত্নে বারদ্বারীর দু'একখানা দুয়ার ভেঙে গেছে, বারদ্বারী বিগতশ্রী। সন্ন্যাসী ভাবলেন, সেখানেই আশ্রয় নেবেন।

কিন্তু কে জানে কেন রাজবাড়ির কয়েকজন লোক সন্ন্যাসীকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলো।

তখন সন্ন্যাসী গোলাপবাগে গেলেন। এবার আর মধ্যে ঢুকলেন

না, ফটকের কাছে ব'সে রইলেন। সেই ফটকের কাছে ছিলো এক বৃদ্ধের দোকান। বৃদ্ধের নাম গোপী।

সন্ন্যাসীকে দেখেই গোপী ব'লে উঠলো—আমাদের ছোটো মহারাজ!

ভূমিষ্ঠ হ'য়ে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করলো গোপী।

আর, মুহূর্তে খবর ছড়িয়ে পড়লো—ছোটো মহারাজ ফিরে এসেছেন।

বিস্তর লোকজন দেখতে এলো সন্ন্যাসীকে। রাজবাড়ির অনেক পুরোনো কর্মচারীরাও এলো।

কুঞ্জবিহারী ঘোষ রাজবাড়ির একজন মুহুরী। সন্ন্যাসীকে দেখে সে গেলো সটান পরাণবাবুর মেজো ছেলে তারাচাঁদের কাছে। তাকে বললো—বাবু, আর দেখতে হবে না। সত্যিই ইনি আমাদের ছোটো মহারাজ।

কথাটা তারাচাঁদের মুখ থেকে পরাণবাবুর কানে গেলো। পরাণবাবু অবিলম্বে একদল লেঠেল পাঠিয়ে দিলেন ঘটনাস্থলে।

লেঠেলের দাপটে সন্ন্যাসী স্থানত্যাগ ক'রে আস্তে-আস্তে উঠলেন। উঠে গেলেন কাঞ্চননগরে।

তা সেখানেও লোকজনের ভিড়। সবাই সন্ন্যাসীকে দেখতে চায়। পরাণবাবু আবার লেঠেলের দল পাঠালেন।

সন্ন্যাসীকে এবার চ'লে যেতে হ'লো দামোদর পার হ'য়ে।

তারপর বিষ্ণুপুরের রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহের রাজদ্বারে গেলেন সন্ন্যাসী। ক্ষেত্রমোহন সন্ন্যাসীকে চিনলেন প্রতাপ ব'লে।

আদর-যত্নে সেখানে কাটলো দু'তিনমাস। একদিন ক্ষেত্রমোহন সন্ন্যাসীকে পরামর্শ দিলেন—আপনি একবার বাঁকুড়ায় যান, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে দেখা ক'রে আপনার অবস্থা তাঁকে জানান। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ভরসা দিলে পুলিশ নিয়ে বর্ধমানে যাবেন। তখন আর পরাণ বাবুর লেঠেল আপনার কিছু করতে পারবে না। পরাণবাবু যদি বিষয়-সম্পত্তি ফিরিয়ে না দেন তো তখন আদালত আছে।

ক্ষেত্রমোহনের পরামর্শ সন্ন্যাসী গ্রহণ করলেন। চললেন বাঁকুড়ার দিকে। একা। অপরিবর্তিত পরিচ্ছদে।

কিন্তু তখন বাঁকুড়ার ওদিকের আবহাওয়া উত্তপ্ত। কিছুদিন আগে মানভূমে একটা হাঙ্গামা হ'য়ে গিয়েছিলো, এমন হাঙ্গামা যা মেটাবার জন্যে প্রয়োজন হয়েছিলো মিলিটারীর সাহায্য। আর তার জের গড়ালো অনেকদূর। পরিণামে সেখানে পলিটিক্যাল এজেণ্ট হ'য়ে এলেন ক্যাপ্টেন উইলকিন্সন।

তার ঢেউ লেগেছে বাঁকুড়ায়। চতুর্দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন বাঁকুড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব। সূচনাতেই বিনষ্ট ক'রে দিতে হবে সমস্ত বিপ্লবের সম্ভাবনা।

এমন সময় বাঁকুড়ায় এলেন সেই সন্ন্যাসী। আশ্রয় নিলেন সরকারী সারকিট হাউসের কাছে এক তেঁতুলতলায়।

সারা বাঁকুড়ায় খবর ছড়িয়ে পড়লো—প্রতাপ ফিরে এসেছেন।

ভিড় হ'লো জনতার। সবাই প্রতাপকে দেখবে।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এ-সুযোগ ছাড়লেন না। সন্ন্যাসীকে গ্রেপ্তার ক'রে পাঠালেন জেলখানায়। আর সরকারের কাছে রিপোর্ট পাঠালেন —একজন বিদ্রোহী গ্রেপ্তার হয়েছে।

সাত-আট মাস পরে বন্দী সন্ন্যাসী প্রেরিত হ'লো হুগলীতে। বিচারে সাব্যস্ত হ'লো—সন্ন্যাসীর ছ'মাস কারাদণ্ড। উপরন্তু, কারামুক্তির পরে সন্ন্যাসীকে দিতে হবে এক বছরের জন্যে চল্লিশ হাজার টাকার ফেলজামিন্।

সন্ন্যাসী বিচারকের কাছে নিবেদন করলেন—আমি এখনো বুঝতে পারলাম না কোন অপরাধের জন্যে আমি দণ্ডিত হলাম।

বিচারক বললেন—তোমার নাম আলোক শা। কিন্তু তুমি মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদ ব'লে ভিড় জমিয়েছো, রাজ্যের শান্তিভঙ্গের উদ্যোগ করেছো।

ছ'মাস কারাদণ্ডের পরে যথাহুকুম ফেলজামিন দিয়ে সন্ন্যাসী মুক্তি পেলেন ১৮৩৭ সালের ফেব্রুআরি মাসে।

সেদিন জেলখানার দরজায় বিশাল জনতা। কলকাতা থেকেও গিয়েছিলেন অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। পঞ্চকোটের রাজা আর বিষ্ণুপুরের রাজাও এসেছিলেন। ওখানকার স্থানীয় ব্যক্তিরাও অভ্যর্থনার

আয়োজন করেছিলেন নানারকম—ইংরেজি বাদ্য, হস্তী, অশ্ব।

জেলখানা থেকে সন্ন্যাসী বেরোলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে হস্তিপৃষ্ঠ থেকে সাড়া দিয়ে উঠলো নহবৎ, দূরে বাজলো কাড়ানাকাড়া। চতুর্দিকের তুমুল হরিধ্বনি আর বিলিতি বাজনার সুরধ্বনি সন্ন্যাসীকে জ্ঞাপন করলো অজস্র হৃদয়ের সানন্দ সম্বর্ধনা।

কয়েকমাস পরে আরম্ভ হ'লো এই বিখ্যাত মোকদ্দমা।

মহাতাপচাঁদ নাবালক। অতএব, মহারাণী কমলকুমারীর পক্ষ হ'য়ে বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করেন পরাণবাবু।

সর্বত্র শুধু মোকদ্দমার বৃত্তান্ত, প্রতাপের প্রসঙ্গ। মেয়েদের মুখে, ভিক্ষুকদের গলায়, পর্যন্ত ছোটো-ছোটো ছেলেদের দলে—প্রতাপ আর প্রতাপ। কৃষ্ণনাম ছেড়ে ভিক্ষুকেরা গেয়ে বেড়ায় প্রতাপের গীত, ভিক্ষুকেরা ভিক্ষে চায় প্রতাপের নাম নিয়ে—প্রতাপের জয় হোক। পথে-ঘাটে দলে-দলে ছোটো ছেলেরা নাচে আর গান গায়—পরাণবাবু, হ'য়ে কাবু, হাবুডুবু খেতেছে।

বর্ধমানের রাজবাড়ি থেকে আদালতে নিয়ে আসা হ'লো এক মূক সাক্ষীকে। একখানা ছবি। চিনারি সাহেব অঙ্কিত প্রতাপের সেই প্রমাণ ছবিখানা। প্রতাপের অনুরোধে চিনারি সাহেব ছবির চেহারাকে বানিয়েছিলেন প্রতাপের সমান লম্বা। রক্তমাংসের প্রতাপের দৈর্ঘ্যের সঙ্গে ছবির প্রতাপের দৈর্ঘ্যের তিলমাত্র পার্থক্য ছিলো না। সেই নীরব নির্বাক সাক্ষী রইলো এজলাসের পাশের ঘরে।

রিডলি সাহেব একজন সাক্ষী। তিনি বললেন—আমি প্রতাপকে চিনতাম। ১৮১৫ সাল থেকে ১৮১৭ সাল পর্যন্ত আমি বর্ধমানে ছিলাম। এই আসামী রাজা প্রতাপের মতো। এঁকে পরীক্ষা করবার জন্যে আমি দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করেছি। ইনি সেসব কথার যথার্থ জবাব দিয়েছেন। আমি জিজ্ঞেস করেছি, 'আপনার কাছে আমি কি কখনো কিছু বিক্রয় করেছি?' ইনি বলেছেন, 'হ্যাঁ। একবার একটি সোনার ঘড়ি বিক্রয় করেছিলে।' আরেকটি কথা জিজ্ঞেস করেছি, 'রাজবাড়ির সিপাহীদের সঙ্গে প্রভিন্সাল সিপাহীদের যে বিবাদ

হয়েছিলো, তা মিটেছিলো কেমন ক'রে ?' ইনি বলেছেন, 'রেভিনিউ বোর্ড আদেশ দেন যে রাজবাড়ির সিপাহীরা সবুজ পোষাক পরবে, তাতেই সে-বিবাদ মিটে যায়।' এ-সবই সত্যি কথা।

প্রিন্সেপ সাহেব গভর্ণমেন্টের সেক্রেটারী। প্রতাপকে তিনি চিনতেন। তিনি বললেন—উনিশ-বিশ বছর যাকে দেখিনি, তার চেহারা যেমন মনে থাকে, প্রতাপের চেহারা আমার তেমনি মনে আছে। পাশের ঘরের ছবির সঙ্গে এ-আসামীর কোনো মিল নেই। আই স্যুড্ সে দ্যাট হি ওয়াজ নট প্রটাপচণ্ডর।

হেরিয়াট বিটিং বললেন—আমি প্রতাপচাঁদকে বিশেষ ভাবে চিনতাম। আমার বয়স যখন ষোলো বছর, তখন আমি এঁকে বহুবার দেখেছি। আমার বাবার বাড়িতেও দেখেছি, অন্যত্রও দেখেছি। ইনি নিশ্চয়ই সেই প্রতাপচাঁদ।

১৮০৮ সাল থেকে ১৮১৭ সাল পর্যন্ত বর্ধমানে কালেক্টর ছিলেন ট্রাওয়ার সাহেব। তিনি প্রতাপকে বিলক্ষণ চিনতেন। আসামীকে কোনোক্রমেই ট্রাওয়ার সাহেব প্রতাপ ব'লে বিশ্বাস করলেন না।

ডাক্তার স্কট সাহেব বললেন—আমি ১৮১৫ থেকে ১৮১৭ সাল পর্যন্ত বর্ধমানে ছিলাম। প্রতাপের সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিলো। ইনিই সেই প্রতাপ। আমি এঁর সর্বাঙ্গের চিহ্ন মিলিয়ে দেখেছি, সব চিহ্নই মিলেছে। ১৮১৭ সালে এঁর গালের মধ্যে একটা ক্ষত হয়, সে-ক্ষতের দাগ এখনো আছে। অন্য লোকে মুখে ক্ষতের দাগ করতে পারে বটে, কিন্তু সেখানেই অবিকল সেরকম পারে না। প্রতাপ শীতকালেও ঘামতেন, আসামীরও সেই অবস্থা। প্রতাপের মতো এঁর বসবার ভঙ্গি, প্রতাপের মতো এঁর হাসি, কথা বলবার আগে প্রতাপের মতো এঁর গলা পরিষ্কার ক'রে নেবার অভ্যাস। পুরোনো কথা এঁকে দু'একটা জিজ্ঞেস করেছি; যেমন, 'আমি কী ক'রে বেড়াতাম ?' আসামী বলেছেন, 'একটা পিস্তল নিয়ে পথে-পথে কুকুর মেরে বেড়াতে।' আবার জিজ্ঞেস করেছি, 'তখন দেওয়ানী জেলে কি একটা গোলমাল হয়েছিলো ?' আসামী উত্তর দিয়েছেন, 'বুলার সাহেব রঘুবাবুকে জেল দিয়েছিলেন। রঘুবাবু সেখানে বিষ খেয়ে

মরেছিলেন। মৃতদেহ চিরে তুমি বিষের কথা বলেছিলে।' এর সবগুলোই সত্যি।

হাচিনসন সাহেব সদর দেওয়ানী আদালতের জজ, আগে ছিলেন বর্ধমানের একটিং জজ। সাহেব বললেন—আসামীর সঙ্গে প্রতাপের ছবির সাদৃশ্য নেই। তবে বুক থেকে ওপরদিকে খানিকটা মেলে। না, এ-লোক প্রতাপ নয়।

ফ্রানসুয়া সুলিম্যান বললেন—আমি প্রতাপকে চিনতাম। প্রায়ই আমি চুঁচুড়া যেতাম, সেখানে প্রতাপকে দেখেছি। একবার নীলকুঠি কিনবার জন্যে আট-দশবার প্রতাপের কাছে যাতায়াত করেছিলাম। ইনিই সেই প্রতাপ।

রাজবাড়ির হাতিশালার দারোগা মোহনলাল। এ-আসামী যে প্রতাপ নয়, সে-বিষয়ে মোহনলাল নিঃসন্দেহ। না, প্রতাপের সঙ্গে আসামীর বয়সে, বর্ণে, দৈর্ঘ্যে, আকৃতিতে কিম্বা কোনো কিছুতেই মিল নেই।

গোলকচন্দ্র ঘোষ বললেন—আমি কিছুদিন ছোটো রাজাকে ইংরেজি পড়িয়েছিলাম। ইনিই সেই ছোটো মহারাজ। একবার শুনেছিলাম, ছোটো রাজা মরেছেন। তার এক মাস পরে আবার শুনেছিলাম—না, ছোটো রাজা মরেন নি, পালিয়েছেন।

রাজা বৈদ্যনাথ রায় বললেন—প্রতাপের সঙ্গে আমার দু'বার দেখা হয়েছিলো। একবার গভর্ণর-জেনারেলের দরবারে, আরেকবার একটা বিয়েবাড়িতে। এ-আসামী রাজা প্রতাপ নয়। আমি কারো কাছে বলিনি যে এ-আসামী নিশ্চয়ই প্রতাপ।

আদালতের বাইরে জনতা রাজা বৈদ্যনাথের গায়ে ধুলো ছুড়েছিলো।

আগা আব্বাছ আলি ছায়ার মতো ঘুরে বেড়াতো প্রতাপের সঙ্গে। সে বললো—ইনিই রাজা প্রতাপ। সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

রাধামোহন সরকার রাজবাড়ির এক মহলের মোক্তার। তিনি গঙ্গাজল হাতে নিয়ে বললেন—প্রতাপের সঙ্গে এই আসামীর প্রচুর পার্থক্য। আসামী লম্বা, কালো, আসামীর হাত-পা বড়ো-বড়ো, ছবির সঙ্গে এর কোনো সাদৃশ্য নেই। আসামী দেখতে যেন ভিকে হাড়ি,

আর প্রতাপ দেখতে ছিলেন বিক্রমাদিত্যের মতো।

সন্ন্যাসীই যে প্রতাপ এই মর্মে সাক্ষ্য দিলেন ফ্রেজর সাহেব, সফিয়া ক্রেন, নাজির গোলাম হোসেন, স্বরূপচন্দ্র গোস্বামী, হাকিম আলি উল্লা, রাজা জয় সিংহ, রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহ, আমীর উদ্দীন আমেদ, রামধন বাগ্দী (পলুতার ঘাটমাঝি), হাজি আবু তালেব প্রভৃতি।

এই সন্ন্যাসী আর প্রতাপ যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি—আদালতে সেকথাও বহু সাক্ষী ঘোষণা করলেন। প্যাটল সাহেব, ফকিরচাঁদ তেওয়ারি হারকুটস সাহেব, বসন্তলাল, ভৈরবনাথ, নন্দলাল, রামচন্দ্র বিশ্বাস, পাল খ্রীষ্টান, মহেশ পণ্ডিত, গঙ্গাগোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং আরো অনেকজন। কেউ-কেউ আবার বললেন—না, ইনি প্রতাপ নন। এর আসল নাম কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী।

ওয়াটালুর যুদ্ধের পর, একবার কলকাতায় রোশনাই দেখতে এসে দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়ির কাছে কান্তবাবুর বাড়িতে ছিলেন প্রতাপ। সে-সময়েই দ্বারকানাথের সঙ্গে প্রতাপের প্রথম আলাপ হয়। সেবারে প্রতাপের সঙ্গে গভর্ণমেণ্ট হাউসের রোশনাই দেখতে গিয়েছিলেন প্রতাপ।

দ্বারকানাথও সাক্ষ্য দিলেন। বললেন—ওগলবির মোকদ্দমায় যখন এই আসামী সুপ্রীম কোর্টে সাক্ষী দিয়েছিলো, তখন আমি একে দেখেছিলাম। সে-সময়ে এ আমাকে চিনেছিলো, কিন্তু আমি একে চিনতে পারিনি।

আদালতে প্রতাপের ছবির সঙ্গে আসামীর সাদৃশ্যের কথা স্বীকার করলেন দ্বারকানাথ। বললেন—আমি ঠিক বলতে পারি না, এ-আসামী প্রতাপ কি না, তবে আমার মনে হয় যে ইনি প্রতাপ নন।

আর, ডেভিড হেয়ার সাহেবও সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—আমি রাজা প্রতাপকে চিনতাম। ১৮১৭ কি ১৮১৮ সালে প্রতাপ যখন কলকাতায় ছিলেন, তখন ছ'সাতবার আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিলো। তাঁর সঙ্গে এই আসামীর বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। পাশের ঘরে প্রতাপের যে ছবি আছে, তার পাশে আসামীকে একবার এদিকে একবার ওদিকে দাঁড় করিয়ে দেখেছি—তার সঙ্গে আসামীর নাক, চোখ, অবয়ব বিলক্ষণ মেলে। আসামীর চিবুক ও নিচের ঠোঁটের

তলে যে গর্তের মতো আছে, তা পর্যন্ত মেলে। আমি যখন আসামীকে প্রথম দেখলাম, তখন তাঁকে প্রতাপের থেকে লম্বা ব'লে মনে হয়েছিলো। কিন্তু ভুল মনে হয়েছিলো। আসামী ঠিক প্রতাপের মতো দীর্ঘ। আসামীকে আমি জিজ্ঞেস করেছি, 'রামমোহন রায়কে মনে আছে?' বহুকাল আগে রামমোহন রায়কে নিয়ে আমি গিয়েছিলাম প্রতাপের সঙ্গে আলাপ করতে। আসামী সেকথা বললো, 'তুমি সেদিন একটা বন্দুকের মতো বাক্স ক'রে একটা দূরবীণ আর একটা খাঁচায় দুটো পাখি নিয়ে গিয়েছিলে। আমরা একসঙ্গে ছাদে গিয়ে কথাবার্তা বলেছিলাম।' সত্যিই তাই। সেই দূরবীণটা প্রায় চল্লিশ ইঞ্চি লম্বা ছিলো, তা-ও আসামীর মনে আছে। আমার বিশ্বাস, ইনিই প্রতাপ।

ইনিই সেই রাজপুত্র প্রতাপ? তাহ'লে তো এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে প্রতাপের মৃত্যু ঘটনা নয়, রটনা। কিন্তু বহু বছর আগে পৌষের এক প্রচণ্ড শীতের রাত্রে কেন এবং কোন্ উপায়ে রাজপুত্র প্রতাপ আপন মৃত্যু রটনা ক'রে সন্ন্যাসী হ'য়ে চ'লে গিয়েছিলেন?

বহুবছর আগের এক হতভাগ্য রাজপুত্রের রহস্যময় কথা ও কাহিনী আদালতে ব্যক্ত করলেন সন্ন্যাসী—

বিমাতা মহারাণী কমলকুমারী ছিলেন আমার পরম শত্রু। ষোলো-সতেরো বছর বয়সের সময় আমাকে খাবারের সঙ্গে দু'বার বিষ দেন কমলকুমারী। একবার আমি তা ফেলে দিয়েছিলাম। আরেকবার খেতে দিয়েছিলাম একটা ইঁদুরকে। তক্ষুনি মারা গিয়েছিলো ইঁদুরটা।

সেদিন থেকে আমি নিজের জন্যে আলাদা রান্না করাতাম। পরাণ বাবু আমার সর্বনাশের জন্যে চেষ্টার ক্রটি রাখতেন না। আমার বাবার মন পর্যন্ত এমনভাবে আমার প্রতি বিরূপ ক'রে দিলেন যে আমার আর উপায় রইলো না।

সেই থেকে আমার অধঃপতনের আরম্ভ। মদের মাত্রা বাড়াতে লাগলাম। পাপ, পাপ, কেবল পাপ। আমি নিরুপায়। আমি মহাপাপী।

মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কী?—জিজ্ঞেস করলাম একদিন কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্যকে।

সব শুনে তিনি বললেন—পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুষানল। অশক্তে, চোদ্দ বছর অজ্ঞাতবাস। কিন্তু এমনভাবে অজ্ঞাতবাস করবে যেন সবাই জানে যে তুমি ম'রে গেছো।

প্রথমবার কাউকে কিছু না জানিয়ে পালালাম। সেবার টের পেয়ে বাবা আমাকে রাজমহল থেকে ধরিয়ে আনেন।

বাবা আমাকে অনেক বুঝিয়েছিলেন, কিন্তু আমি কিছুই বুঝিনি, আমি শুধু বুঝেছি আমি মহাপাপী, আমার প্রায়শ্চিত্ত প্রয়োজন, কৃষ্ণ কান্তের উপদেশমতো আমাকে চোদ্দবছর অজ্ঞাতবাসে যেতে হবে। কিন্তু আমার অজ্ঞাতবাসের কথা যেন কেউ জানতে না পারে, যেন সবাই জানে—প্রতাপচাঁদ মরেছে।

অসুখের অভিনয় ক'রে গেলাম কালনায়। কথা ছিলো, কালনার ঘাটে কালীপ্রসাদ একখানা ভাউলিয়া এনে রাখবেন। আর, ভাউলিয়া এলেই কালীপ্রসাদ বাবু করবেন শঙ্খধ্বনির সঙ্কেত। শুয়ে-শুয়ে শুনলাম সেই সঙ্কেত। তারপর বিকারের রোগীর মতো ভুল বকতে লাগলাম। সবাই তখন আমাকে পাল্কিতে গঙ্গাতীরে নিয়ে গেলো। অন্তর্জলি করলো। অন্তর্জলির পর রাজবাড়ির অধিকাংশ লোক শীতে কাহিল হ'য়ে চ'লে গেলো তাঁবুর মধ্যে। দু'চারজন মাত্র আমার কাছে ছিলো। তাদের প্রতিজ্ঞা করিয়ে আমি নিঃশব্দে বিদায় নিলাম। সতর্ক হাতে সাঁতার কেটে গিয়ে উঠলাম বজরায়। শেষরাত্রে বজরা চললো মুরশিদাবাদ।

মুরশিদাবাদ এবং ঢাকা হ'য়ে আমি আর কালীপ্রসাদ গিয়ে তীর্থস্নান করি ব্রহ্মপুত্রের জলে। তারপর ঘুরে বেড়িয়েছি নানা স্থানে। কাশী, প্রয়াগ, চিত্রকূট, অযোধ্যা, বৃন্দাবন, মথুরা, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, বদরিকাশ্রম, হরিদ্বার এবং আরো অনেক তীর্থক্ষেত্র। কাশ্মীরে থেকেছি দু'বছর। প্রায়ই আমি যোগীদের সঙ্গে বেড়াতাম। যখন যাঁদের দেখা পেতাম, তখন তাঁদের সঙ্গ নিতাম।

আরেকটি কথা। যাবার আগে আমি নিজের একখানা প্রমাণ ছবি

আঁকিয়ে রেখে গিয়েছিলাম। সেখানা এখানে আনা হয়েছে। বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে নানা পরিবর্তন হ'তে পারে, কিন্তু শারীরিক দৈর্ঘ্যের কোনো অদল-বদল হয় না। সেই ছবির সঙ্গে আমাকে মেপে দেখা হয়েছে —দৈর্ঘ্যের কোনো তফাৎ হয়নি। আমার আর বিশেষ কিছু বলবার নেই। এখন বিচারকর্তা পরমেশ্বর আর···

বিচারের ফল দেখলাম—এই সন্ন্যাসী আসল প্রতাপ নয়, জাল প্রতাপ—

ভাগ্যক্রমে সন্ন্যাসী আসামী হয়েছিলেন, পরিণামে আসামী আবার সন্ন্যাসী হলেন। এই প্রশান্তমূর্তি সন্ন্যাসীর প্রতি সাধারণ নরনারীর সমবেদনার অন্ত নেই। অজস্র কষ্ট পেয়েছেন সন্ন্যাসী, এবার সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার অবসান হোক।

সন্ন্যাসীর জন্যে, নিজের জন্যে, সকলের জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি—আমাদের সমস্ত পাপ মার্জনা করো। আমাদের কল্যাণ করো। যত্তদ্রং তন্ন আসুব॥